দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ৪ নভেম্বর, ২০২৪
১৮ কার্তিক, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬
website : www.eswastika.com

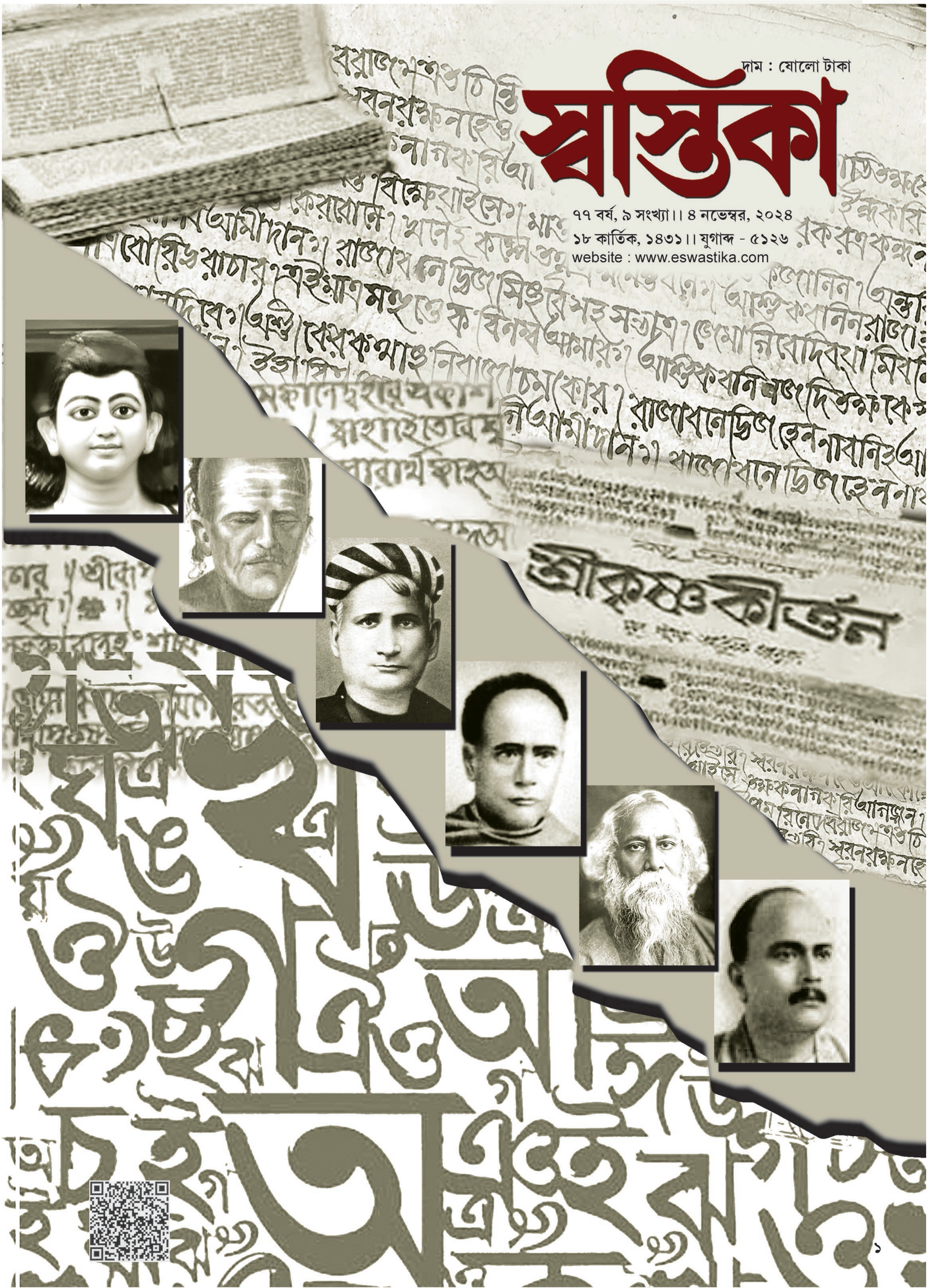

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ১৮ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৪ নভেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

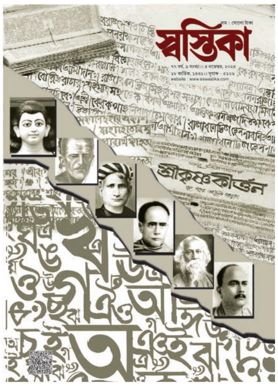

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

ঝড়ে বক মরে মুখ্যমন্ত্রীর কেরামতি বাড়ে জয় করে তবু ভয়... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

কল্যাণ দাদার কল্যাণ চাই ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতীয় সার্বভৌমত্বের উপর নেমে আসতে পারে যে আঘাত ◻ সিদ্ধার্থ দাভে ◻ ৮

বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির কৃতিত্ব কার? ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বাঙ্গালি হিন্দুরা আজ 'নাথবতী অনাথবৎ' ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

বাঙ্গালির বড়ো প্রাপ্তি বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা ◻ প্রবীর ভট্টাচার্য ◻ ১৩

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিতে বাংলাভাষা আজ আভিজাত্যে অভিনন্দিত ◻ ড. স্বপন কুমার মণ্ডল ◻ ১৫

ধ্রুপদী বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার গুরুত্ব ◻ ড. রাকেশ দাশ ◻ ১৭

বাঙ্গালি ও বাংলাভাষার উৎস সন্ধানে ◻ রীণা বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ১৮

ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দেরিতে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ১৯

বাঁকুড়ার সরাক সম্প্রদায়ের বিস্তার এবং জৈন পুরাকীর্তির সন্ধান ◻ বিপ্লব বরাট ◻ ৩১

বঙ্গবিদ্যা চর্চার পরিধি ও পরিক্রমা ◻ মহাশ্বেতা চক্রবর্তী ◻ ৩৫

বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ার দিনে আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদকে মনে রাখতে হবে ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৪৩

ধ্রুপদী ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৪৫

ধ্রুপদী বাংলা কার্যকরী বিকাশের জন্য চাই ভারতীয় বঙ্গবিদ্যা সংস্থান ◻ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৬

জেহাদি অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের গন্তব্য কোথায়? ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **খেলা : ৩৬** ◻ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০**

প্রকাশিত হবে ১১ নভেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১১ নভেম্বর, ২০২৪

এক দেশ — এক নির্বাচন

১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সেইসময় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমস্ত রাজ্য সরকারগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেশজুড়ে বলবৎ ছিল এই ব্যবস্থা। আগামীদিনে লোকসভা এবং সমস্ত বিধানসভা নির্বাচন একযোগে করার জন্য 'এক দেশ— এক ভোট' বর্তমান ভারত সরকারের একটি বিবেচনাধীন প্রস্তাব। দেশের উন্নয়নের অগ্রগতির কথা মাথায় রেখেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, আনন্দমোহন দাস, ধর্মানন্দ দেব প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা

এইবার দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বাংলা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা প্রতিটি বঙ্গভাষীর পক্ষে খুবই গৌরবের বিষয়। বাংলাভাষা ভারত তথা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধ ভাষা। বিশ্বের ৩০ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। এই ভাষায় কত না সাহিত্য, সংগীত, নাটক রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন কৃত্তিবাস, কাশীরাম, চণ্ডীদাস, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদের ন্যায় লেখক, সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, নাট্যকার। ভারতের জাতীয় স্তোত্র এবং জাতীয় সংগীত রচিত হইয়াছে বাংলাভাষায়। ২০০৪ সালে ভারতীয় ভাষাগুলিকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। তাহার জন্য কয়েকটি মানদণ্ড স্থির করা হয়। যেমন, সেই ভাষার দেড় হইতে দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস থাকা আবশ্যক। বহু প্রজন্ম সেই ভাষায় কথা বলিবার ইতিহাস থাকিতে হইবে। পদ্য ও গদ্য লিখিবার পরম্পরা থাকিতে হইবে। শিলালিপি অথবা সেই ধরনের প্রমাণ থাকিতে হইবে এবং সেই ভাষা ও সাহিত্যের যোগসূত্র থাকিতে হইবে। ২০০৪ সালে এই সব মানদণ্ড পূরণ করিবার ফলে তামিল এবং তৎপরবর্তীতে সংস্কৃত, তেলুগু, কন্নড়, মালায়লাম ও ওড়িয়া ভাষাকে ধ্রুপদী মর্যাদা দান করা হইয়াছে। সেই সময় বাংলাভাষার প্রাচীনত্বের ইতিহাস তুলিয়া ধরিবার মতো কাহারও মন ও মানসিকতা ছিল না। সমস্ত ভারতীয় ভাষার জননী যে সংস্কৃতভাষা তাহা ভারতবাসীর মন ও মস্তিষ্ক হইতে উধাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরবপন্থী এবং বিদেশি মতাদর্শে জারিত গবেষকগণ ইন্দো-ইরানীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে বাংলাভাষার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় রচিত বেদ যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য, সেই বেদের ভাষাকে সংস্কৃত না বলিয়া বৈদিক বা আর্যভাষা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। বাঙ্গালি জাতি ও বাংলাভাষাকে তাহারা অর্বাচীন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গের উল্লেখ রহিলেও তাঁহারা বাঙ্গালি জাতি বা বাংলাভাষার কথা সুচতুরভাবে অস্বীকার করিয়াছেন।

অবশেষে সকল ভ্রান্তি ও অপপ্রচারের অবসান ঘটাইয়া বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষাশিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের নির্দেশক ড. স্বাতী গুহ এবং তাঁহার দল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাংলাভাষার প্রাচীনত্ব বিষয়ে গবেষণা করিয়া ২২০০ পৃষ্ঠার প্রমাণ দাখিল করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলাভাষা ধ্রুপদী মর্যাদা লাভ করিবার সমস্ত মানদণ্ড পূর্ণ করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে বাংলাভাষা আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। খুবই আনন্দের বিষয় যে, ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা লাভ করায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বাংলাভাষায় বিশেষজ্ঞদের জন্য দুইটি বিশ্বমানের পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করিয়াছে। ধ্রুপদীভাষা মর্যাদা লাভের কারণে সেন্টার ফর এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলা পঠনপাঠনে জোর দেওয়া হইবে। প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পড়ানো হইবে। প্রাচীন পুঁথি ও গবেষণালব্ধ রচনা সংরক্ষণ করা হইবে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণ করা হইবে। বিভিন্ন ভাষায় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হইবে। বাংলা নিয়ে উচ্চশিক্ষায় বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিবে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষা নিয়ে পড়াশোনা করিলে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা লাভের এই আনন্দঘন মুহূর্তে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে।। বাংলাভাষায় পঠনপাঠন, গবেষণা, ডিগ্রি লাভ সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার রীতিও চালু করিয়াছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। এই কথা সত্য যে, বাংলাভাষাকে অচ্ছুত করিয়া রাখিয়াছিল কংগ্রেস দলই। কংগ্রেস অধিবেশনে এই বঙ্গভূমিতেই তাহারা ইংরেজিভাষায় ভাষণ দিতেন। বাংলাভাষায় কথা বলিতে এবং পুত্র-কন্যাদিগকে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করাইতে যাঁহারা লজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন, বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা লাভে তাহাদের লজ্জার কিছুটা হইলেও উপশম হইবে বই কী! পরিশেষে, বাংলাভাষাপ্রেমী বাঙ্গালির পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্বস্তিকা পত্রিকার একটি বিনম্র দাবি, বাংলাভাষার অধিক গবেষণার নিমিত্ত তৈরি হউক 'ভারতীয় বঙ্গবিদ্যা সংস্থান'। আর একটি বিষয়ে প্রকৃত বাঙ্গালিদের সচেতন থাকিতে হইবে, তাহা হইল বাংলাভাষার যেন আরবীকরণ না হইয়া পড়ে।

সুভাষিতম্

অর্থা ভবন্তি গচ্ছন্তি লভ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
পুনঃ কদাপি নায়াতি গতং তু নবযৌবনম্।।

ধনসম্পদ আসে এবং চলে যায়। চলে গেলে তা আবার লাভ করা যায়। কিন্তু তারুণ্য একবার চলে গেলে আর কখনো ফিরে আনা যায় না।

ঝড়ে বক মরে মুখ্যমন্ত্রীর কেরামতি বাড়ে

জয় করে তবু ভয়...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সব সমাজেই 'সিনিক' আর 'স্যাডিস্ট' থাকে। নিন্দুক আর মানসিক ধর্ষকামী। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম নয়। একটা উদ্ভট ধারণা তৈরি হয়েছে কন্যা অভয়ার বিচারের আন্দোলন থমকে গিয়েছে। কিছু বোদ্ধার দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক শৈলী (যা নেই) কাজে লাগিয়ে আন্দোলন শেষ করে দিয়েছেন। অথচ এ ব্যাপারে মমতার ন্যূনতম ভূমিকা নেই। ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। আন্দোলনকারীদের অনশন তোলার অনুরোধ মমতা আগেই করেছিলেন। মমতার প্রথমবারের অনুরোধে অনশন ওঠেনি। এই মুহূর্তে অভয়ার বিচার ঘিরে রাজ্যে মমতা বিরোধী বহু মুখের মধ্যে রয়েছে তিনটি প্রধান মুখ— অভয়া, তার বাবা আর মা। তাঁদের অনুরোধে অনশন উঠল, লাগাতার কর্মবিরতি হলো না তাতে কোনো ফয়দা নেই। চটকদারি হয় না। তাই মমতাকে কাজে লাগাও। স্তাবক আর মূর্খরা এই ধরনের নেতা পছন্দ করেন। তাতে পাওনা গণ্ডার সুবিধা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী স্তাবক মূর্খদের সঙ্গে পেতে চান কিন্তু তাদের অসম্মান করে সমাদর করেন। দালাল চক্র তা বুঝেও বোঝে না। ১৯৮৩-র ডাক্তারদের আন্দোলনের সঙ্গে এবারের চিকিৎসক আন্দোলনের সাদৃশ্য বের করতে গিয়ে তারা অর্ধসত্য আর দালালির সীমা ছাড়িয়ে যায়। স্বীকার করতে লজ্জা পায় সে লড়াই ডাক্তাররা গর্বের সঙ্গে জিতেছিলেন। বহিরাগত বামপন্থী জ্যোতি বসু লাঠি চালিয়ে আর হুমকি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে হেরে যান। দু'টি আন্দোলনে অনেক ফারাক। এখানে খুনের বিচার আর নিরাপত্তা। ১৯৮৩-র আন্দোলন— পরিকাঠামো, বেতন আর অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার লড়াই। মমতাকে জিতিয়ে দেওয়ার আনন্দে যারা মশগুল তাদের জানার সীমা অল্প। কারণ মমতার চেয়ে কেউ বেশি জানবেন এটা নিশ্চয় শাসক হিসেবে তিনি পছন্দ করবেন না। মমতা ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেই পাঠ স্তাবকরা নিয়েছে। তোতাগিরি করে বলছে, দেখলেন তো মমতা কী ধুরন্ধর।

আন্দোলনটা ভেঙে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি সব ধরনের রাজনৈতিক সেটিঙে-এ পারদর্শী। মানে মমতা হলেন রাজনৈতিক ধান্ধাবাজ। অবোধের গোবধে আনন্দ। অভয়াকাণ্ডের পর থেকেই মমতা রাজনৈতিকভাবে সিঁটিয়ে রয়েছেন। একটিবারও আরজি কর হাসপাতালে পা দেননি। হয়তো 'গো ব্যাক' স্লোগান শোনার ভয়ে। কেন যাননি এই প্রশ্নটা কেউ করেনি। ১৯৯০ সালে বানতলায় নারী নির্যাতনের ঘটনার পর জ্যোতি বসুর না যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মমতার মতোই সেদিনের 'গ্রেট কালচারের' বাম ব্যবসায়ীরাও প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন বানচালের চেষ্টা করেছিল। প্রশ্নকারী প্রবীণ সাংবাদিকটিকে ব্যারাকিং করা হয়েছিল। তবে লাভ হয়নি। এই আন্দোলন হাইজ্যাক করতে এখন তেলে জলে মিশে গিয়েছে।

নাগরিক আন্দোলন ভাঙতে মমতার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু সিপিএম। তাই বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য 'গো ব্যাক' স্লোগান আর সিপিএমের বিমান বসু আর মহম্মদ সেলিমদের কাছে আহ্বান। বামফ্রন্টের গ্রুপ অ্যাপ ব্যবহার করে জমায়েতের আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাহলে কি আন্দোলন ঠেকাতে মমতা বামেদের হাতেই রশি ছেড়েছেন? গত ১৪ আগস্ট রাতে আন্দোলন ঠেকাতে তৃণমূল গুন্ডাবাহিনী নামিয়েছিল। তারপর আরজি কর চত্বরে তাদের আর দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই দোষীরা এখন সবাই মুক্ত। ওই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় না মমতা— কার মদত ছিল তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। তবে ওই ঘটনার পর দলের উপর আর কোনো ভরসা না রেখে মমতা আমলা নির্ভর হয়ে গিয়েছেন। এটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে কোনো কারণে মমতা কোথাও ভীত হয়ে পড়েছেন।

তাই 'কনফিডেন্স বিল্ডিং' বা মনের জোর জোগাতে গোটা শাসন ব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে কিছু নিরীহ যুব চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। মমতা ভালো জানেন কেন অনশন চালানো কঠিন কাজ আর তা চালাতে গেলে কী করতে হয়। নবীন চিকিৎসকরা তা জানেন না। তাই তারা কেবল অনশনটাই করে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে লড়াইয়ে মমতা জিতে গিয়েছে এই ধারনা একবারেই ঠিক নয়। আপাতভাবে মমতা জয় করেছেন কিন্তু ভয় তাঁর যায়নি। কীসের ভয়? 'দফা এক দাবি এক, মমতার পদত্যাগ?' আন্দোলন চলবে আর ২০২৬ অবধি সেই ভয় মমতাকে তাড়া করবে। ■

নাগরিক আন্দোলন ভাঙতে মমতার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু সিপিএম। তাই বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য 'গো ব্যাক' স্লোগান আর সিপিএমের বিমান বসু আর মহম্মদ সেলিমদের কাছে আহ্বান।

কল্যাণ দাদার কল্যাণ চাই

কল্যাণপ্রিয়েষু দিদি,

আজ চিঠি দিদি একটা নালিশ নিয়ে। এটা সত্যিই নালিশ করার মতো ঘটনা। জানি, আপনি কিছুই করবেন না তবু লিখছি কারণ, নিজেকে বলতে পারব দিদির কল্যাণ চেয়ে দাদা কল্যাণের নামে নালিশটুকু জানিয়েছিলাম আমি।

সংসদ ভবনে বিতর্ক চলার সময়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলের বোতল ভাঙা এবং তার জেরে নিজেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ার ঘটনা ইতিমধ্যেই দেশের সবাই জেনে গিয়েছে। আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস তা নিয়ে গৌরব বোধ করতেই পারে কিন্তু আমি দিদি পারছি না। সাংসদ এ-হেন আশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করতে পেরেছেন বলে আপনিও কি গৌরবান্বিত!

এই রাজ্যের জনপ্রতিনিধিরা দেশের সামনে রাজ্যের ঠিক কী ছবি তুলে ধরছেন, সে কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমোদ পেতে পারে কিন্তু গর্ব নয়। এই সভ্যতাবিবর্জিত আচরণ এ রাজ্যের পরিচয় তো হতে পারে না। কিন্তু বারবার এই ধরনের কাজের উদাহরণ তৈরি হলে পশ্চিমবঙ্গের নাম খারাপ হবেই। নেতাদের ব্যবহারের সঙ্গে রাজ্যের সম্মানের বিষয় তো জড়িয়ে দিদি। এই সত্য মনে রাখার দায় রাজ্যের নেতাদের আছে বলে মনে হয় না।

আপনারও কি দায় নেই দলের প্রতিনিধিদের শাসন করার? এর আগেও রাজ্যের মুখ পুড়িয়েছেন কল্যাণ। উপরাষ্ট্রপতির নকল করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সম্মান নিয়ে খেলেছেন। দিদি, আপনার দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র আরও বড়ো লজ্জা তৈরি করেছে। এর পরেও তাঁরা জিতে সংসদে গিয়েছেন। যদি সেটাই মানুষের রায় হয়ে থাকে তবে মেনে নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ এমন জনপ্রতিনিধিই চায়। এরই যোগ্য রাজ্যের মানুষ।

আরও একটি কথা দিদি। কল্যাণের বোতল ভাঙার দিনের বিতর্কের বিষয় ছিল, ওয়াকফ জমি ও তার মালিকানা সংক্রান্ত আইনি সংশোধনী। কেন্দ্রীয় সরাকার প্রস্তাবিত ওয়াকফ আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে কুকর্মটি করলেন, তাতে কেবল রাজ্যবাসীর অসম্মান হলো না, ভারতীয় সংখ্যালঘু সমাজের জন্যও তা মঙ্গলের হলো না। ওয়াকফ বোর্ড বিতর্কে সংখ্যালঘুদের খুশি করতে আপনার দলের রাজনীতিকরা কথা বলেন সব সময়। দেশের কথা কখনও ভাবেন না। এমনকী, মুসলমান সমাজের উন্নতি হোক সেটাও চায় না। সেই ধারা বজায় রেখে কেবল সংখ্যালঘু তোষণকারী নন, সেই সঙ্গে যে 'অসামাজিক', 'বিশৃঙ্খল' তার প্রমাণ মিলেছে এই ঘটনায়। আসলে আপনারই তো ভাই। অতীতে বিধানসভায় ভাঙচুরের মতো ঘটনায় আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর কল্যাণ দাদা তো শুধুই একটা বোতল ভেঙেছেন। এর আগে তৃণমূল বিধায়ক স্কুলের শিক্ষককে জলের জগ ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এবার বোতল।

> **দেশব্যাপী বিপুল পরিমাণ জমি ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত, যা সরাসরি ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন, তার কেনাবেচা ভূমিরাজস্ব সব কিছুর অধিকারই বোর্ডের হাতে। সংশোধনী বিল পাশ হলে সেই নিয়ন্ত্রণের অনেকাংশ চলে আসবে সরকারের অধীনে। এটা হলে কার ক্ষতি?**

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সংসদে দু'টি বিল পেশ করেন, একটি ওয়াকফ সংশোধনী বিল, অন্যটি মুসলিম ওয়াকফ রিপিল বিল। একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি তৈরি হয়, যার একাধিক বৈঠকে উত্তপ্ত সংঘর্ষময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইন্ডি জোটের প্রতিনিধিরা আইনি সংস্কারের কারণ না বুঝে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়ে এটা তৈরি করেছেন। প্রতিটি সংস্কারের ক্ষেত্রেই তাঁরা এটা করে থাকেন। আর তৃণমূল হচ্ছে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আর সব দলের মধ্যে কে কত মুসলমানপ্রেমী তার প্রতিযোগিতা তো লেগেই থাকে। দেশপ্রেম না থাকলেও চলবে, মুসলমানপ্রেম থাকা চাই। সেই প্রতিযোগিতায় বোতল ভেঙে কল্যাণ কি বেশি নম্বর পেলেন?

বর্তমানে দেশব্যাপী বিপুল পরিমাণ জমি ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত, যা সরাসরি ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন, তার কেনাবেচা ভূমিরাজস্ব সব কিছুর অধিকারই বোর্ডের হাতে। সংশোধনী বিল পাশ হলে সেই নিয়ন্ত্রণের অনেকাংশ চলে আসবে সরকারের অধীনে। এটা হলে কার ক্ষতি? দেশের লাভ তো রয়েছেই সেই সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বুঝছেন এর ফলে অনেক অনাচার বন্ধ হবে।

রাষ্ট্রীয় পরিসরের সঙ্গে এই ধরনের সংগঠনের সম্পর্ক স্থাপন তো জরুরি।

সাচার কমিটির রিপোর্টে (২০০৬) স্পষ্ট তথ্যপ্রমাণ মিলেছিল যে ওয়াকফের হিসাবে অনেক গরমিল রয়েছে। তখন বিজেপি ক্ষমতায় ছিল না। দিদি, আপনাদের ইউপিএ আমল সেটা। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিজেপির আনা বিলটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নিয়ে বিরোধী দলের আপত্তি ও সমালোচনারও কম গুরুত্ব নেই।

বিতর্কের মধ্য দিয়েই সত্যে উপনীত হতে হয়। কিন্তু উত্তেজনা ও আক্রমণ পরিহার করে দায়িত্বসহকারে আলোচনা জরুরি। জনপরিসরে এ বিষয়ে সচেতন মতামত তৈরি করাও জরুরি। সেটাই তো রাজনৈতিক দলের কাজ। বোতল ভাঙা কি কোনও সাংসদের কাজ হতে পারে দিদি? □

অতিথি কলম

সিদ্ধার্থ দাভে

ভারতীয় সার্বভৌমত্বের উপর নেমে আসতে পারে যে আঘাত

যেকোনো মূল্যে ভারতীয় সমাজের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে। সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক লাইনে দেশকে টুকরো টুকরো করতে উদ্যত যে কোনো কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দ্বারা এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।

বেশ কয়েকটি নামকরা বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং তাদের দ্বারা এফসিআরএ-র অনুমতির শর্ত লঙ্ঘনের ঘটনাকে ঘিরে সামনে আসা তথ্যগুলি সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে এসেছে। ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বিপুল পরিমাণ বিদেশি অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে বলে সেই সংবাদে প্রকাশ। আয়কর বিভাগ পরিচালিত তদন্তগুলিতে ধরা পড়েছে প্রথম সারির এনজিওগুলির কার্যকলাপ এবং তাদের অর্থায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে চূড়ান্ত অসঙ্গতি। এনজিওগুলির সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের পরিণামে সংঘটিত দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিষয়টিও উঠে এসেছে এই তদন্তে। যার ফলে সমাজসেবী ও দাতব্য সংস্থার পরিচয়ের আড়ালে ক্রিয়াশীল এই সংস্থাগুলির আসল ভূমিকা নিয়ে উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। এটি কিন্তু আর্থিক অব্যবস্থা বা আইন ভাঙার মতো কোনো সাধারণ সমস্যা নয়। এটি জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়।

গণতন্ত্রে 'নাগরিক সমাজ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রাপ্ত বিদেশি তহবিলের ধরনটিকে যাচাই করার উপর আলোকপাত করে আয়কর বিভাগ দ্বারা পরিচালিত তদন্তসমূহ। এই ধরনের লেন-দেনগুলি যাচাইয়ের বিষয়টিও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাও তুলে ধরেছে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ। জাতীয় স্বার্থের পক্ষে হানিকর কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত অর্থের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকেও সাম্প্রতিক তদন্তগুলি উল্লেখযোগ্য।

এনজিওগুলির উপর চলতে থাকা তদন্তে সন্দেহজনক লেন-দেন ছাড়াও অন্যান্য যে তথ্যগুলি উঠে এসেছে তা বেশ উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছাড়াও ধর্মান্তরণের লক্ষ্যে বিদেশি উপাসনা পদ্ধতিজাত মত ও পথের প্রচার সেগুলির মধ্যে অন্যতম। সেবামূলক ও দাতব্য সংস্থা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণের লক্ষ্যে জনস্বার্থে কাজ করার পরিবর্তে তাদের বেআইনি কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত বর্তমানে জনসমক্ষে আসছে। বিদেশি অর্থায়নের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এদের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়াকলাপ এবং ভারতের অভ্যন্তরে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন গভীর থেকে গভীরতর করার ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলির ভূমিকা রীতিমতো উদ্বেগজনক।

এখানে অভিযোগ শুধুমাত্র তহবিলের অপব্যবহার সম্পর্কে নয়। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে বিদেশি অর্থের ব্যাপক প্রয়োগ এবং বিদেশি উপাসনা পদ্ধতিজাত মত-পথের প্রচার-প্রসারে এই অনুদানের যথেচ্ছ ব্যবহার হলো এনজিওগুলির বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

বিদেশি মতাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায়-যোগ : তদন্তাধীন বেশ কয়েকটি এনজিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিযোগে অভিযুক্ত। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে উপাসনা পদ্ধতিগত মত-পথ, জাতি ও বর্ণভিত্তিক বিভাজনের বিষয়গুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি সংস্থা কিছু তথাকথিত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত বিদেশি তহবিলকে এতদিন ব্যবহার করে এসেছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি বা নির্বাচন চলাকালীন অরাজকতা ছড়ানো-সহ নানা প্রচেষ্টা এই তহবিলকে ব্যবহার করে তারা চালিয়ে গিয়েছে। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে ওকালতি করার বিষয়টিকে ঢাল করে চলছে তাদের কাজকর্ম। আপাতদৃষ্টিতে এই কাজ হয়তো অনৈতিক বা বেআইনি নয়, কিন্তু তাদের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করার এই কর্মকাণ্ডে স্বার্থান্বেষী বিদেশি সংস্থাগুলি যখন অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে তখন তা হয়ে ওঠে উদ্বেগজনক। এই অর্থায়ন— প্রকৃত উন্নয়ন এবং সব বিভাজন মিটিয়ে সম্প্রদায়গত সংহতির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক উসকানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে উঠে এসেছে নানা অভিযোগ। ভারতের অনেকগুলি অঞ্চলে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটের কিছু অংশে (যেসব এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর ইতিহাস রয়েছে) বিদেশি উপাসনা পদ্ধতিপ্রসূত মত-পথ এবং জাতিগত বিভাজনধর্মী বক্তব্য প্রচারের অভিযোগে এই সংস্থা অভিযুক্ত। বিদেশি অর্থদাতাদের পাঠানো অনুদানে পরিচালিত এই প্রচারাভিযানগুলির উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক ন্যারেটিভ নির্মাণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে উপাসনাপদ্ধতি-উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোটদাতাদের মেরুকরণ করে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে তারা সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করে বলে অভিযোগ। বিদেশি স্বার্থে সংঘটিত এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ভারতীয় সমাজের মধ্যে বিভাজনকে আরও বাড়ানোর কাজটাই করে। তার সঙ্গে দেশের গণতান্ত্রিক ও পন্থনিরপেক্ষ কাঠামোকে ধ্বংস করে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের নামে

রাজনৈতিক লবি : সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শকে সামনে রেখে বা পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে সক্রিয়তার অন্তরালে রাজনৈতিক পটভূমিকে প্রভাবিত করার খেলায় চলছে নানা তদ্‌বির। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই লবির করার জন্য কিছু এনজিও-র বিরুদ্ধে বিদেশি তহবিল ব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে। 'দ্য এনভায়রনিক্স ট্রাস্ট' ও 'লাইফ' নামক দু'টি সংস্থা ভারতে কয়লা খনি এবং বিভিন্ন জ্বালানি প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে, মামলামোকদ্দমা খাড়া করে প্রকল্পগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার কাজে যুক্ত। 'ইওরোপিয়ান ক্লাইমেট ফাউন্ডেশন'-এর মতো বিদেশি সংস্থার সহযোগিতায়, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকারী পরিচয়ে পরিচিত বিদেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে তারা ভারতে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে দেখানোর চেষ্টা চললেও, এই আন্দোলনগুলির পিছনে রয়েছে একটি রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। সেই অ্যাজেন্ডা যা শিল্প ও শক্তিক্ষেত্রগুলিকে পঙ্গু করে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করতে চায়। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির জন্য যে ক্ষেত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ, সেই ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নকে রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে সক্রিয় এই অ্যাজেন্ডা।

'লাইফ' সংস্থার প্রাপ্ত বিদেশি তহবিলের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। বিভিন্ন প্রকল্প, বিশেষত যেগুলির আদানি যোগ রয়েছে সেগুলিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে এই সংস্থা। বেছে বেছে টার্গেট করে এই প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। পরিবেশ সচেতনতার আওয়াজ তোলা বা পরিবেশরক্ষার আন্দোলন যখন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়ে থাকে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে যখন সীমাবদ্ধ থাকে সব সমালোচনা ও প্রতিবাদ--- তখন এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারাভিযানের মুখ ঘুরে যায় কিছু হাইপ্রোফাইল কোম্পানির দিকে। পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধানে সব পক্ষকে শামিল করে নিরপেক্ষ, সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর পরিবর্তে একটি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত অ্যাজেন্ডাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে যাবতীয় আন্দোলন।

বর্ণবৈষম্যমূলক-জাতিবিদ্বেষী অ্যাজেন্ডার প্রচার-প্রসার : বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি তহবিল ব্যবহার করে জাতিবিদ্বেষমূলক অ্যাজেন্ডা প্রচার-প্রসারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে অনেক এনজিও। সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য চলছে এই অ্যাজেন্ডার প্রয়োগ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী--- বিদেশি অর্থদাতাদের অর্থে পুষ্ট কিছু এনজিও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু বাস্তবে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ন্যারেটিভ প্রচার-প্রসারে তারা সক্রিয় থেকেছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের এই প্রচারাভিযান। কখনও কখনও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বৈধতাকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে এইসব আন্দোলন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকারগুলির বিরুদ্ধে এমন আন্দোলন খাড়া করে যা উন্নয়নের পরিপন্থী; অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক।

'সার্ভাইভাল ইন্টান্যাশনাল' হলো একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। সংস্থাটি ভারতীয় এনজিওগুলির সঙ্গে যৌথভাবে ভারতে কাজ করে। ঝাড়খণ্ডের কিছু উপজাতি গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে সম্প্রতি তারা সোচ্চার হয়। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদে সরব হতে দেখা যায়। বৃহত্তর সমাজের স্বার্থহানি ঘটিয়ে একটি গোষ্ঠীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের তরফে চলে স্রেফ কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন। এই কান্নার আড়ালে সবার অলক্ষ্যে তারা জাতিগত বিভাজনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে চলেছে, জাতীয় জীবনের মূলধারা থেকে প্রান্তিক জনজাতিগোষ্ঠীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জনজাতি সমাজকে জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচির বাইরে রাখার প্রচেষ্টায় সংঘটিত হচ্ছে এইসব আন্দোলন। 'জনজাতিদের অধিকার রক্ষা'-র আন্দোলন হিসেবে এইসব কার্যকলাপকে তারা তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকে। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে শিল্পোন্নয়নকে থমকে দেওয়ার জন্য নিরন্তরভাবে সক্রিয় রয়েছে নানা বিদেশি ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাধারা। সেই শক্তিগুলির স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে চলেছে এই আন্দোলন।

বিদেশি অর্থে রাজনৈতিক প্রচার : ভারতের অভ্যন্তরে নানা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য, এমনকী নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কয়েকটি এনজিও-র দ্বারা বিদেশি তহবিল ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় বিদেশি অর্থে পুষ্ট কিছু এনজিওকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা গিয়েছে। নানা সামাজিক কর্মসূচিতে অর্থদানের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে সমর্থনের সেই হাত। নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই দলগুলির তরফে দেওয়া রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের অন্তর্গত ছিল সেইসব সামাজিক কর্মসূচি। নির্বাচনের সময় কিছু সম্প্রদায়কে এই এনজিওগুলি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দান করে। এই কায়দায় নির্বাচনকে পরোক্ষে প্রভাবিত করার একটি প্রক্রিয়ার রূপদান করে তারা, যা বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিজাত মতাবলম্বী এবং নানা জাতিগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলিকে নির্বাচন চলাকালীন এগিয়ে রাখে। বিদেশি অর্থবলে, রাজনৈতিক সক্রিয়তার এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে যখন বিভিন্ন দল পরিচালিত হতে থাকে, তখন তা হলো এফসিআরএ বিধির সরাসরি উল্লঙ্ঘন। এফসিআরএ আইনে বর্ণিত নিয়মানুসারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিদেশি অনুদানের ব্যবহার নিষিদ্ধ। সামাজিক দানখয়রাতি বা দাতব্য কর্মসূচির মুখোশের আড়ালে থাকা এই বেআইনি ক্রিয়া-কলাপগুলিকে চিহ্নিত করা একটি কঠিন কাজ। এনজিওগুলির বিরুদ্ধে চলা তদন্তে এই প্রক্রিয়ার যেসব ধরনধারণ উঠে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিদেশি অর্থে পরিচালিত সামাজিক কর্মসূচিগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের গভীর যোগ রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে অস্থির অঞ্চলগুলিতে এই অদ্ভুত যোগাযোগ একটি রীতিমতো উদ্বেগজনক বিষয়। এমতাবস্থায়, যেকোনো মূল্যে ভারতীয় সমাজের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে; সেই লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অতি আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক লাইনে দেশকে টুকরো টুকরো করতে উদ্যত যে কোনো কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দ্বারা এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।

(লেখক পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ)

বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির কৃতিত্ব কার?

এবছরের ৩ অক্টোবর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার বৈঠকে বাংলা, মারাঠি, পালি, প্রাকৃত ও অহমীয়া ভাষাকে ধ্রুপদীভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের অনুমোদন হয়। ইতিপূর্বে সংস্কৃত, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কন্নড় ও ওড়িয়া ভাষাকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এবার আরও পাঁচটি ভাষা এই মর্যাদা পেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে বাংলাভাষাকে ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে কৃতিত্ব কার তা নিয়ে যথারীতি চাপানউতোর শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) পোস্ট করে বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভারত সরকার একটি ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা দিয়েছে। অনেকদিন ধরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে এই সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিপুল তথ্য জমা দিয়ে দাবি করছিলাম যাতে বাংলাভাষাকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।' তিনি আরও দাবি করেছেন, 'আজ আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। কেন্দ্রীয় সরকার আজ সন্ধ্যায় আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। অন্য কয়েকটি রাজ্যের ভাষা আগে এই স্বীকৃতি পেলেও বাংলাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। ভালো লাগছে, আমাদের লড়াইয়ে অবশেষে বাংলাভাষা এই অভিপ্রেত ও ন্যায্য স্বীকৃতি পেল।'

এরপর বলাই বাহুল্য যে, রাজ্যের শাসক দলের নেতা, সমর্থক, মন্ত্রী, সাংসদরা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বলতে থাকেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই বাংলা ধ্রুপদীভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে, কয়েকবছর আগে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড ইন্ট্যানজেবল হেরিটেজের তালিকায় কলকাতার দুর্গাপূজা স্বীকৃতি পাওয়ার পর একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কৃতিত্ব দাবি করা। যদিও এই কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের অধিকর্তা তপতী গুহঠাকুরতা। যিনি এক দশকের বেশি সময় ধরে দুর্গাপূজা নিয়ে কাজ করছেন। ২০১৫ সালে দুর্গাপূজা নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীর একটি বই 'ইন দ্য নেম অব দি গডেস : দ্য দুর্গাপূজা ইন কন্টেম্পোরারি কলকাতা' প্রকাশিতও হয়েছিল। দুর্গাপূজা যাতে ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পায়, সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই তপতী গুহঠাকুরতাই।

কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের অধিকর্তা গুহঠাকুরতা ফিল্ড এক্সপার্ট ছিলেন। যাতে দুর্গাপূজাকে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে খসড়া ডসিয়ার তৈরি করে ২০১৯ সালের মার্চে জমা দিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক পর্যটনের জন্য দুর্গাপূজাকে বিবেচনা করা যায় কিনা, কয়েক বছর পর থেকে সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন আসতে থাকে। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর ময়দানে নামে। অথচ কী আশ্চর্য, ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির দাবিদার হয়ে গেলেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী! এবারেও নেপোয় দই মারার ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। 'ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ' (আইএলএসআর)-এর তৈরি বাংলাকে ধ্রুপদীভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের ২২০০ পাতার দাবিপত্রটি এবছরের জানুয়ারিতেই নির্মিত হয়। আইএলএসআর-এর নির্দেশক ড. স্বাতী গুহ এবং এই সংস্থার অধীন স্কুল অব লিঙ্গুয়িস্টিক স্টাডিজের অধ্যাপক অমিতাভ দাসের নেতৃত্বে ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ মিলে পাঁচ সদস্যের দল এই দাবিপত্রটি তৈরি করেছে। রাজ্য সরকারের তরফে তা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং সাহিত্য অ্যাকাদেমির কাছে পেশ করা হয়। জাতীয় স্তরে সাহিত্য অ্যাকাডেমি ভাষা বিশেষজ্ঞদের কমিটি তৈরি করেছিল। তারা নির্দিষ্ট মাপদণ্ডের ভিত্তিতে কোনো ভাষা ধ্রুপদী কিনা তা নিয়ে সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয়।

নিয়ম মেনে রাজ্য সরকারের পক্ষে কেন্দ্রের কাছে আর্জি এবং কেন্দ্রে মন্ত্রীসভার সায়, এইভাবেই স্বীকৃতি আসে। এর মধ্যে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসেন কোথা থেকে? শুধুমাত্র আইএলএসআর রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন এই অজুহাতে সব কৃতিত্ব তাঁর হয়ে যায় না। রাজ্যে সবকিছু তাঁর 'অনুপ্রেরণা'য় চললেও জাতীয় স্তরের এই স্বীকৃতিতে তাঁর নেপোয় দই মারার প্রচেষ্টা আখেরে যাঁরা প্রকৃত কৃতিত্বের দাবিদার, তাঁদের বঞ্চিত করবে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

একথা আমাদের ভুললে চলবে না, তাঁর প্রশাসনের আমলেই দাড়িভিটে রাজেশ-তাপসের মতো ভাষা আন্দোলনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দিনের পর দিন তিনি ভোট রাজনীতির স্বার্থে-আরবি- উর্দু-মিশ্রিত সম্পূর্ণ বিজাতীয় একটি জগাখিচুড়ি ভাষাকে বাংলাভাষা হিসেবে প্রমোট করে আখেরে বাংলাভাষারই ক্ষতি করেছেন। তাঁর তাবেদারি করার জন্য অমুকপক্ষ-তমুকপক্ষ গড়ে তিনি শুধু ইতিহাসের বিকৃতকরণকেই স্বীকৃতি দেননি, ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদের পাঁচিলও তুলেছেন। বাঙ্গালি জাতির অস্মিতার পক্ষে এ নিতান্তই লজ্জার, কারণ সমগ্র দেশকে এই বঙ্গভূমিই জাতীয়তার, স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিল। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এর জন্য নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করে বলেছেন, বাঙ্গালি হিসেবে গর্ব করার দিন। সাহিত্য অ্যাকাডেমির অধীনে ভাষা বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত এই সম্মান সম্ভব ছিল না। সেই সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই বাংলা-সহ পাঁচটি ভাষাকে ধ্রুপদীভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সব সদস্যের ধন্যবাদ প্রাপ্য। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অধিকাংশ সময় কংগ্রেসি রাজত্ব এবং অনেকটা সময় এরাজ্যে বাম শাসন থাকলেও বাংলাভাষার উন্নতির পেছনে এদের অবদান আদৌ আছে কী, এই প্রশ্নটাও কিন্তু উঠছে। □

বাঙ্গালি হিন্দুরা আজ 'নাথবতী অনাথবৎ'

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

শুরুটা হয়েছিল শীতলকুচি দিয়ে। তারপর একে একে ফালাকাটা, গার্ডেনরিচ হয়ে এসে থামলো হাওড়ার শ্যামপুরে এসে। কী ভাবছেন পূজা পরিক্রমার কথা বলছি? না, ঠিক তা নয়। বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে কদিন ধরে বাঙ্গালি হিন্দুর উপর ধরে ঘটে চলা জেহাদি তাণ্ডব পরিক্রমার কথা বলছি।

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল ২৯ সেপ্টেম্বর, পূজার প্রায় ১০ দিন আগে। অনেকটা সেই খুঁটি পূজার মতো, শুভ উদ্বোধন! কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রামে। নির্মীয়মাণ পূজা প্যান্ডেলের বাঁশের মাচায় রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে কে বা কারা আস্ত একটা জবাই করা গোরুর মুণ্ডু রেখে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার অবমাননার সূচনা করেছিল সেদিন।

দ্বিতীয় ঘটনা ১১ অক্টোবর, দুর্গাষ্টমীর দিন। স্থান খোদ কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, গার্ডেনরিচ। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ হেডকোয়ার্টার লালবাজারের প্রায় নাকের ডগায়। মুসলমান অধ্যুষিত ওই পূজা প্যান্ডেলে সেদিন ভক্তিমূলক গান, চণ্ডীপাঠ বাজানোর অপরাধে হামলা চালিয়েছিল জেহাদিরা। আয়োজকদের মেরে ফেলার হুমকি, মেয়েদের অশ্রাব্য গালিগালাজ, মাইকে চণ্ডীপাঠ বন্ধ না হলে মূর্তি ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি সবই দেওয়া হয়েছিল। দাবি এই, মুসলমান মেজরিটি এলাকায় হিন্দুদের পূজা প্যান্ডেলে চারদিন ধরে মাইক বাজানো যাবে না। এতে তাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে। বাঃ, কী দারুণ ভ্রাতৃত্ববোধের নমুনা! এই পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার মসজিদে প্রতিদিন দিনে পাঁচবার মাইকে উচ্চৈঃস্বরে আজান দিলে হিন্দুদের ডিস্টার্ব হয় না, ডিস্টার্ব হয় বছরে মাত্র চারদিন হিন্দুরা চণ্ডীপাঠ করলে? কী সুন্দর 'ভাইচারা', সহভ্রাতৃত্বের নমুনা!

পরের ঘটনা ১৩ অক্টোবর, দশমীর দিন। স্থান, হাওড়ার শ্যামপুর বাজার, ব্যবসায়ী সমিতির পূজামণ্ডপ। সেখানে সেদিন ছিল ছোটোদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিষয়, বিভিন্ন মনীষীদের ছবি আঁকা। সেই মতো উদ্যোক্তারা মঞ্চে বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গে সঙ্গে হজরত মহম্মদের একটি ছবিও কোথা থেকে জোগাড় করে এনে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাস, সেই শুরু। সে খবর রাষ্ট্র হলো। একে একে জেহাদিরা জড়ো হলো মন্দির প্রাঙ্গণে। শুরু হলো প্রবল আপত্তি। কর্মকর্তারা বুঝলেন একটু বেশি সেকুলারগিরি হয়ে গেছে। ক্ষমা চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি খুলে নিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। শুরু হলো মণ্ডপ ভাঙচুর। জেহাদিদের হাত থেকে নিস্তার পেল না দুর্গা প্রতিমাটিও, ভাঙা হলো সেটি। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানশূন্য নির্বোধ উদ্যোক্তাদের সেকুলারগিরিতে বিপদে পড়লেন হিন্দুরা। পাড়ার পাড়ায় চললো উন্মত্ত তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ। পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতায় জেহাদের সব রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো সেখানে। প্রথমে শীতলকুচির মণ্ডপে গো-মুণ্ড রেখে যার সূচনা, মাঝে গার্ডেনরিচে মণ্ডপ ও প্রতিমা ভাঙার হুমকি, শেষে শ্যামপুরে হাতে-কলমে দুর্গামূর্তি ও মণ্ডপ ভাঙা— ক্রমান্বয়ে এই তিন ঘটনার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে জেহাদের অ্যাসিড টেস্ট সম্পন্ন হলো।

> **পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য হিন্দুরা অনাথ, যেন নাথবতী অনাথবৎ। ওদের আছে বুলডোজার, আমাদের আছে তোষণ। তাই আমাদের ধর্ম আমাদেরই রক্ষা করতে হবে।**

এই ঘটনাগুলির দ্বারা জেহাদিরা বাঙ্গালি হিন্দুকে একটি গভীর বার্তা দিল। সে বার্তা হলো 'আমরা সংখ্যায় বাড়ছি। আমরা অচিরেই পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশে পরিণত করব। চালু করব শরিয়তি শাসন। বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো তোমাদের দশা হবে। শাসন-প্রশাসন আমাদের পক্ষে।' যারা আজ হিন্দুর পূজা-অর্চনায় বাধা দিচ্ছে এরা কারা? এরা সকলেই পাকপন্থী হিন্দু বিরোধী, জেহাদি। এদের বাপ্-দাদুরাই ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের দাবিতে দাঙ্গা করেছিল। হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা যায় না তাই মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ চাই বলে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এদেরই পূর্বপুরুষ দেশভাগের পরে পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গে না গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের তৈরি হিন্দু বাঙ্গালির শেষ আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গেই থেকে গিয়েছিলেন। তাদের ছেলেপুলে নাতিপুতিরাই আজকে এই রাজ্যে হিন্দুর পূজাপার্বণ, উৎসবে বাধা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের বহু মৌলানা তাদের ভাষণের সরাসরি বলছে, ইসলামের জন্ম হয়েছে মূর্তি ভাঙতে, তাদের রক্তে বইছে

ফঃ ২

মূর্তি ভাঙার ইতিহাস। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেইসব ভিডিয়ো ঘুরেও বেড়াচ্ছে। এই মোল্লামৌলবিরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধ্যুষিত বিভিন্ন জেলায় অবাধে জলসা, ধর্মীয় সভা করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন নিশ্চুপ, শাসকের অঙ্গুলিহেলনে সব কিছু চলছে। আর সেই সব জেহাদি ভাষণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে হিন্দুর পূজা ও উৎসবগুলিতে।

বাঙ্গালির দুর্গাপূজায় এত বড়ো আক্রমণের ঘটনার পরেও নিজেদের বাঙ্গালি বলে দাবি করা শিক্ষিত মুসলমানরা কিন্তু এর প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করেনি। যারা বলেন সব মুসলমান খারাপ নয়। তারা বলুন এই ইস্যুতে সেই প্রগতিশীল ভালো মুসলমানদের কোনো প্রতিবাদ, কোনো স্টেটমেন্ট সামনে আসছে না কেন? এই ভালো লোকগুলি যদি বাঙ্গালি সমাজের এই দুঃসময়ে প্রতিবাদ না করেন, তবে তারা সমাজের কোনো কাজে লাগবে? তারা আর কবে সামনে এসে দ্বিতীয় কুসুমটির হয়ে দু'চার কথা বলবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান— 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার।' এ যে কত বড়ো মিথ্যা, এই ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ। এই জেহাদি আক্রমণ আজ প্রমাণ করলো 'ধর্ম যার, উৎসবও তার'।

জেহাদিদের এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনও হিন্দুর সনাতনী সংস্কৃতিকে চরম অপমান করেছে। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে সরকারি কর্মীরা মা-দুর্গার বিসর্জনের সময় অন্যায়ভাবে ইলেকট্রিক করাত দিয়ে প্রতিমার হাত-পা, বিভিন্ন অঙ্গ টুকরো টুকরো করে কেটে বিসর্জন দিচ্ছে। এ হিন্দুর চিরাচরিত রীতিনীতির ওপর আঘাত। বোধনের সময় চক্ষুদানের মাধ্যমে যে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তাকে বিসর্জনের আগে কেটে টুকরো টুকরো করা? এমন অনৈতিক অধার্মিক কাজ শাসন প্রশাসন করবে? এক তৃণমূলি বন্ধু বলছিলেন এতে নাকি জল দূষণ অনেক কমে যাবে। তাকে বলেছিলাম, যদি তাই হয় তবে তার গর্ভধারিণী মা যখন মারা যাবেন, তখন যদি তাকে দাহ না করে কুকুর শেয়াল দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রেও তো বায়ু দূষণের পরিমাণ অনেক কমে যায়। তা কি করা উচিত? হিন্দু সমাজের এত বড়ো অপমান দেখেও ভাতাজীবী বাঙ্গালির রক্ত আজও যেন বড্ড শীতল।

আত্মসম্মানযুক্ত বাঙ্গালি হিন্দুকে আজ স্বধর্ম রক্ষায় মুখর হতেই হবে। তার ধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যেই যাক--- সে সরকারই হোক বা সমষ্টি বিশেষ, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। নীতি শাস্ত্রে বলে, শুধু দেহ থেকে প্রাণ নির্গত হওয়াকেই মৃত্যু বলে না, নিজের ধর্ম সংস্কৃতির উপর আঘাত হচ্ছে দেখে চুপ থাকাটাও এক প্রকার মৃত্যু। হিন্দুর সব দেবতার হাতে অস্ত্র কীসের ইঙ্গিত? অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য। তাই ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র ওঠাতে হবে। বাঙ্গালি হিন্দুকে বুঝতে হবে, শুধু বড়ো বড়ো পূজাপ্যান্ডেল করে পূজা করলে, অষ্টপ্রহর কীর্তন গাইলে ধর্ম বাঁচবে না। স্বধর্ম রক্ষায় দুষ্ট অসুরদের বিনাশ চাই।

ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন— সনাতন ধর্মই আমাদের কাছে জাতীয়তা। এই হিন্দু রাষ্ট্র সনাতন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে, সনাতন ধর্ম শেষ হয়ে গেলে এই হিন্দু রাষ্ট্রের পতন অনিবার্য। ধর্ম না বাঁচলে রাষ্ট্রও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। তাই ধর্মকে বাঁচাতে সব হিন্দুদের একত্রিত হতেই হবে।

গার্ডেনরিচ, শ্যামপুর, শীতলকুচি নিয়ে আমাদের বামপন্থী নেতা সুজন, বিকাশ, শতরূপদের কি কিছু বলতে শোনা গেছে? অথবা তৃণমূলের কোনো নেতা-নেত্রীকে? 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' নীতিতে বিশ্বাস করা বামদলের আগুনখোর নেত্রী মীনাক্ষী-দীপ্সিতা, বা শাসক দলের সর্বজ্ঞ-মুখপাত্র ঘোষ-বোসদের মুখে কোনো প্রতিবাদ? আপনারা কী সরকারি দুধেভাতে পোষা ভাতাখোর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মুখেও কি সামান্য প্রতিবাদটুকু শোনা গেছে? না তাও শোনা যায়নি। তাদের হিন্দু অনুগামীদের ভালো করে ভাবতে, হিন্দু ধর্মের বিপদে এরা সবাই লুকিয়ে পড়বেন, কাউকে কাছে পাওয়া যাবে না। এভাবে চললে হিন্দু বড়োজোর দশ-পনেরো বছর রাত জেগে ঠাকুর দেখে বেড়াবে। তারপর তাকে হয়তো তার মূর্তি আর প্যান্ডেল বাঁচাবার জন্য রাত জেগে পাহারা দিতে হবে।

অনেকে বলছেন শুধু কি পশ্চিমবঙ্গে? এবার উত্তরপ্রদেশের বাহারাইচে বিসর্জনের শোভাযাত্রাতেও জেহাদিরা তাণ্ডব করেছে, পাথর ছুঁড়েছে, দাঙ্গা করেছে, রামগোপাল মিশ্র নামে এক হিন্দু যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। হ্যাঁ, তারা ঠিকই বলছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, উত্তরপ্রদেশেও এই ঘটনা ঘটেছে, এটা সত্যি। কিন্তু তারপর? আর পরের অ্যাকশনগুলো নজর করলে দেখা যাবে, ইউপি পুলিশ সেদিন রাতেই ১৮ জন-সহ মূল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রতিদিনই অপরাধীদের পাকড়াও চলছে। তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দিতে জেহাদিদের বাড়ির সামনে বুলডোজার পৌঁছে গেছে। আর হিন্দুরা? শীতলকুচি, ফালাকাটা, গার্ডেনরিচ, শ্যামপুরের ঘটনায় কজন গ্রেপ্তার হলো? কোথায় কোথায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ইউপি পুলিশের মতো অ্যাকশন নিল? এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাইদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন বাঙ্গালির চোখে পড়েছে কি? না, পড়েনি। ইউপির হিন্দুদের ভাগ্য ভালো যে, তাদের একজন নাথ আছে, যোগী আদিত্যনাথ। আর হিন্দু বাঙ্গালিরা?

পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য হিন্দুরা অনাথ, যেন নাথবতী অনাথবৎ। ওদের আছে বুলডোজার, আমাদের আছে তোষণ। তাই আমাদের ধর্ম আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। সঙ্গে মনে রাখতে হবে যোগীমন্ত্র--- 'বাঁটোগে তো কাটোগে'। হিন্দুরা যদি জাতপাতে বিভক্ত হয়ে থাক, একতাবদ্ধ না হয়, তবে ধ্বংস অনিবার্য। বাঙ্গালি হিন্দু যেদিন এটা বুঝবে সেদিন সে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, পূজাপার্বণ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিজেরাই রক্ষা করতে পারবে। ❑

বাঙ্গালির বড়ো প্রাপ্তি বাংলা ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

এবারে দুর্গা পূজায় দেবী পক্ষেই বাঙ্গালির সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি বাংলা ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা। গত বছর ইউনেস্কো কর্তৃক বাঙ্গালির দুর্গাপূজাকে বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে বহু বছরের প্রাচীন এই পূজা আন্তর্জাতিক মান্যতা পায়। ফলে এতদিন ধরে মুঘল শাসক আকবরের সময়কালে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সময় কালেই এই পূজার সূচনার ভ্রান্ত ইতিহাস থেকে বাঙ্গালি মুক্তি পায়। বাংলা ভাষার ধ্রপদী মর্যাদাও মাত্র হাজার বছরের বাঙ্গালির ভাষা সংস্কৃতির মিথ্যা ইতিহাসের অন্ধকূপ থেকে মুক্তি পেল। সমগ্রবিশ্ব এবার জানতে পারবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতির মতোই বাঙ্গালির ভাষা সংস্কৃতিও বহু সহস্রাব্দ প্রাচীন। অনেকেই বিশেষ করে বামপন্থীরা এনিয়ে অপপ্রচার শুরু করেছে, তা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। তবে আগে বাঙ্গালির প্রাচীন ঐতিহ্যকে সকলের সামনে তুলে ধরা দরকার।

জাতি হিসেবে বাঙ্গালি অন্তত চার হাজার বছর ধরে পূর্ব ভারতে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটি মন্ত্র থেকে জানা যায়,

প্রজাহি তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ণান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে
বৃহদ্ধ তস্থৌ ভুবনেষ্বন্তঃ পবমানো হরিত অ বিবেশ।

(ঋগ্বেদ ৮।১০১।১৪)

অর্থাৎ সরস্বতী সভ্যতার বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর তিন প্রজা অতিক্রমণ করে গমন করেছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনী অগ্নির চতুর্দিকে আশ্রয় করেছিল এবং ভুবনমধ্যে আদিত্য মহান হয়ে অবস্থান করেছিল। বঙ্গ জাতিগোষ্ঠী প্রতীক বা টোটেম হিসেবে 'পক্ষী' ব্যবহার করত। বঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র পাণ্ডু রাজার ঢিবি (আনুমানিক ২০০০ বছরের প্রাচীন) থেকে গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদি সভ্যতার চন্দ্রকেতুগড় পর্যন্ত একাধিক পক্ষীমাতৃকার মূর্তি এবং পক্ষীমাতৃকার উপাসনার একাধিক নিদর্শন দেখা যায়। পক্ষীভাষী চিহ্নিত এই বঙ্গজাতি থেকেই যে পক্ষীমাতৃকা উপাসনার ধারা চলে আসছে তা অনুমেয়। বঙ্গভাষার নির্দিষ্ট লিপি ছিল। 'বুদ্ধচরিত' রচয়িতা অশ্ব ঘোষ উল্লেখ করেছেন--- গৌতম বুদ্ধ কপিলাবাস্তর গুরুগৃহে বঙ্গলিপি অধ্যয়ন করতেন। বৈদিক সমাজে একে পক্ষীভাষা বলা হতো। কারণ লিপির অক্ষরগুলো ব্রাত্য সংস্কৃতির পক্ষীমাতৃকার বিভিন্ন রূপ থেকে নির্মিত, এক একটি বাংলা বর্ণ বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রতীক থেকে উদ্ভূত। সেজন্য আজও তন্ত্রধর্মে বর্ণমালার উপাসনা করা হয়।

মহারাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালের সময়কাল সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ীয় সভ্যতার উত্থানের সঙ্গেই বঙ্গের কথ্য ভাষা হিসেবে উদ্ভূত হয় 'গৌড়ীয়প্রাকৃত'। শশাঙ্ক যুগ, চন্দ্র সাম্রাজ্যের সময়কালে এর বিস্তার। এরপর পালযুগে বজ্রযানী সিদ্ধাচার্য ও নাথপন্থী শৈবসাধকদের দ্বারা রচিত হয় 'চর্যাপদ', যা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে গৃহীত।

ড. নির্মল দাস-কৃত চর্যাগীতি পরিক্রমা শীর্ষক গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন গ্রন্থাগারিক তথা সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে সর্বমোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পুনরাবিষ্কার করেন; এই পদগুলির সংকলন চর্যাপদ বা চর্যাগীতির ভাষাকে প্রায়ই 'সন্ধ্যাভাষা' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে এবং সেই সন্ধ্যাভাষা অর্থ ও রূপগত দিক দিয়ে আধুনিক বঙ্গভাষারই আদিরূপ।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি খ্রিস্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম দশকে রচিত, কেননা এই পদগুলির রচয়িতা শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর (যেমন লুইপাদ), তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে। এই হিসেবে বঙ্গভাষার আদিরূপে রচিত সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে এখনো পর্যন্ত পাওয়া প্রমাণাদির মধ্যে সর্বপ্রাচীন এই চর্যাগীতির বয়স কমপক্ষে বারো-তেরোশো বছর দাঁড়ায়।

শুধু চর্যাপদেই যে প্রাচীন বঙ্গভাষার নিদর্শন রয়েছে, তাও নয়। এর বাইরেও বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের গোড়ায় অথবা মধ্যে প্রাচীন বঙ্গ ভাষায় রচিত পদ, দোহা, মঙ্গলাচরণ ও ভণিতা জাতীয় রচনার নিদর্শন যথেষ্ট রয়েছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাতন বাঙ্গলা বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থের ভূমিকায় চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং ডাকার্ণবকে প্রাচীন বাঙ্গলা নিদর্শন বলে দাবি করেছেন। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যা গান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করে এগুলিকেই প্রাচীন বাঙ্গলার নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন।

> **দুর্গাপূজার ঐতিহ্যবাহী মর্যাদায় প্রাচীন বাঙ্গালির উপাসনা সংস্কৃতির গবেষণা, আলোচনার যেমন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাতে আরববাদীদের গাত্রদাহ হবেই, কিচ্ছু করার নেই।**

গৌড়েশ্বর মহীপাল (৯৭৭-১০২৭ খ্রি) মাহমুদ গজনভিকে পরাজিত করে বারাণসী ধাম রক্ষা করে ১০০টি ঈশান-চিত্র ঘণ্টা মন্দির নির্মাণ করে সারনাথে যে শিলালিপি স্থাপন করেন, তাতে আধুনিক বঙ্গলিপির বিকাশের আদিরূপ লক্ষ্য করেছেন ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাজা বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশাস্তির লিপিকে আধুনিক বঙ্গলিপি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দেব বংশীয় পঞ্চম নৃপতি দনুজমাধব রায়ের আদা বাড়ি তাম্রশাসনও বঙ্গলিপিতে খোদিত।

গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ শ্রমণ পুরুষোত্তম রচনা

করেছিলেন গৌড়ীয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ 'লঘুবৃত্তি' বা 'ভাষা বৃত্তি'। তাঁর রাজসভায় নারায়ণ দত্ত রচনা করেন 'ত্রিকাণ্ড শেষ' নামক গৌড়ীয় অভিধান। গৌড়েশ্বর বিশ্বরূপ সেনের শাসনকালে প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসনে আধুনিক বঙ্গলিপির প্রকৃত পরিপূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, বিশ্বরূপ সেনের শাসনকালে প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসনে আধুনিক বঙ্গলিপির প্রকৃত পরিপূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, বিশ্বরূপ সেনের পিতা মহারাজা লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে শ্রীক্ষেত্রে, বারাণসীতে, বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণীতে 'সমর জয় স্তম্ভ মালা' স্থাপন করেছিলেন। এটিই প্রথম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বঙ্গলিপিতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন। সেনযুগের অবসান ও দেবযুগের সূচনার আগে থেকেই দেববংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষণার একাধিক নিদর্শন দেখা যায়। পাকামোড়া তাম্রশাসনে দেববংশীয় চতুর্থ নৃপতি দামোদর দেবের উল্লেখ রয়েছে যিনি তুর্কিদের পরাজিত করে গৌড় পুনরুদ্ধার করেন এবং গৌড়ে মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এই তাম্রশাসনও সম্পূর্ণ বঙ্গলিপিতে খোদাই করা। দেববংশীয় পঞ্চম নৃপতি বঙ্গাধিপতি দনুজমাধব দশরথদেব বা রাজা দনুজ রায়ের আদাবাড়ি তাম্রশাসনও বঙ্গলিপিতে উৎকীর্ণ। পাকামোড়া তাম্রশাসনের ভাগবত বিষ্ণুচক্রে বঙ্গের অক্ষরের উল্লেখ আছে। সেখানে লেখা আছে, 'খ্যাতো গৌড়মহীমহোৎসবময়ং চক্রে পুনশ্চ শ্রিয়া' অর্থাৎ তিনিই সুদর্শকারী বিষ্ণুপদধন্য দেবান্বয় কুলকমল নৃপতি দামোদর, যিনি গৌড়দেশের নষ্টশ্রী উদ্ধার করে গৌড়ে মহোৎসব সম্পন্ন করেছিলেন।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থেকে প্রাপ্ত দুটি মুদ্রায় স্পষ্ট বঙ্গলিপিতে 'শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ' ও অন্য পৃষ্টে রাজার নাম 'শ্রীশ্রী দনুজমর্দনদেব'/ 'শ্রীমন্মহেন্দ্রদেবস্যঃ' খোদিত আছে। মহারাজাধিরাজ রামনাথ দনুজমর্দনদেব (১৩৪৪-১৪১৭)-এর নেতৃত্বে অখণ্ড বঙ্গ সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে বাঙ্গালির জাতিসত্তা ও ভাষা সংস্কৃতি জগতে নব্য জোয়ার আসে। দেবশাসনাধীন নবহট্ট (আজকের নৈহাটি) অঞ্চলে বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণরা এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। নবদ্বীপ অঞ্চলে বিভিন্ন টোল ও গুরুকুলে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রচর্চায় বাঙ্গালি সংস্কৃতি নবউদ্যমে বিকশিত হতে থাকে। শিখরভুম রাজ্যের কুলগুরু আচার্য পদ্মনাভ, 'পদচণ্ডিকা' খ্যাত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র, কবি কৃত্তিবাস ওঝা প্রমুখ দিকপালগণ নবহট্টে রাজা দনুজমর্দনদেবের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন। পরমভাগবত বৈষ্ণব দেববংশজাত রাজা রামনাথের পৃষ্ঠপোষণায় এখানে কৃত্তিবাস ওঝা রচনা করেন অষ্টকাণ্ডবিশিষ্ট 'শ্রীরাম পাঁচালি' বা বাংলা রামায়ণ।

বাঙ্গালির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশে আরও একটি উল্লেখযোগ্য স্থান 'মল্লভুম'। মল্লভূমের মাটিতেই বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন প্রভাবে উৎপন্ন হয় বঙ্গের নিজস্ব ধ্রুপদী শাস্ত্রীয় সংগীতরীতি 'বিষ্ণুপুরি' ঘরানা। ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে মল্লভূমের মহারাজা শিবসিংহ মল্লের রাজত্বকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস সময়কাল থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরানার আদিপর্বের সূচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের আদর্শেই বাংলা ভাষায় রচিত, রাগ-তালে নিবন্ধ প্রথম কাহিনি কাব্য, যা একই সঙ্গে কাব্য ও গীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। মল্লরাজ বীর হাম্বিরের শাসনকালে (১৫৮৬-১৬২০) শ্রীনিবাস আচার্য (জন্ম-১৫১৬) শাস্ত্রীয় কীর্তন ও শাস্ত্রীয় কথকতায় মল্লরাজসভা প্রভাব বিস্তার করলে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে খেতুরির মহোৎসবে নরোত্তম দাস উদ্ভাবিত শাস্ত্রীয় কীর্তন থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তন ঘটে।

এই মোটামুটি বাংলা ভাষার আদি ও মধ্য যুগের ইতিহাস। ২০০৪ থেকে ২০১৪-র মধ্যে সংস্কৃত ছাড়া তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম ও ওড়িয়া ভাষাকে সরকার ধ্রুপদী মর্যাদা দেওয়ায় দেশের বিভিন্ন অংশে সেই সেই এলাকার প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ধ্রুপদী মর্যাদা দেওয়ার দাবি ওঠে। ২০১৪ সালে রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যখন দেশীয় ভাষাগুলি নিজের ভাষার প্রাচীনত্বের দাবি জানাচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বাম ও তৃণমূলি সাংসদেরা কী করছিলেন, বাঙ্গালি এতদিন সেই প্রশ্নই তুলছিল। অনেকেই জানেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তথাকথিত বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরা তখন কলকাতার রাজপথে দোকান থেকে হিন্দি সাইনবোর্ড নামাতে ব্যস্ত ছিলেন। বাংলাদেশের অনুকরণে অকারণে, অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এবং খেয়ালখুশিমতো লিপির গঠনের পরিবর্তন করে আসছিল বাম ও তৃণমূলের শাসনাধীন সরকার। দুর্গাপূজার আগেই উপহারের মতো কেন্দ্র সরকার আরও পাঁচটি ভারতীয় ভাষা অসমীয়া, পালি, প্রাকৃত, মারাঠী ও বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী মর্যাদা দেওয়ায় বাঙ্গালিদের স্বপ্ন সার্থক হয়ে ভাষার ধ্রুপদী অর্থাৎ প্রাচীন সত্তার অস্তিত্ব রক্ষা পেল।

বাংলা ভাষা তো একটি জনগোষ্ঠীর কেবলমাত্র মুখের ভাষা নয়, সেই জনগোষ্ঠীতে প্রবাহিত কয়েক সহস্রাব্দ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাও বটে। বঙ্গদেশে সনাতনী সংস্কৃতিই যুগ যুগ ধরে বয়ে চলা এই ভূখণ্ডে বাঙ্গালির পরিচয় বহন করে। ষষ্ঠ শতকে মহারাজা শশাঙ্কের সময়কালে গৌড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গদেশে সনাতনী বাঙ্গালি সংস্কৃতির পুনরুত্থান ঘটে। ভাষার পাশাপাশি বাঙ্গালির বাদ্য, নৃত্য ও সংগীতের প্রাচীন ঐতিহ্যও রয়েছে। আশির দশকে অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় বাঙ্গালির ধ্রুপদী নৃত্য 'গৌড়ীয়' পুনরুদ্ধার হয়। পণ্ডিতদের মতে চর্যাপদে বর্ণিত প্রবন্ধগীতি বা বিষ্ণুপদগীতি পরবর্তীকালে সংগীতের দুটি ধারায় প্রবাহিত হয় ধ্রুপদী ও কীর্তন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে ধ্রুপদ উত্তর ভারতে বিকাশ লাভ করে। স্বাধীনতার পর সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি এই সংগীতকে মান্যতা দিলেও কীর্তনের মর্যাদা এখনও অধরা।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বাদ্যযন্ত্র 'মৃদঙ্গ'র সরাসরি রূপ 'শ্রীখোল'-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্রীখোলকে নিজের প্রিয় সখা নিত্যানন্দ বলে সম্বোধন করেছেন। বাঙ্গালির সাংগীতিক পরিচয় যেমন কীর্তন, তেমনি কীর্তনের অনুষঙ্গ শ্রীখোল ব্যতীত কীর্তন পরিবেশন সম্ভব নয়। এখন প্রয়োজন কীর্তন ও শ্রীখোলের যথাযোগ্য মর্যাদার। এজন্য হয়তো আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে। বাংলা ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদায় বাঙ্গালির সনাতনী সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে গতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করা যাবে। ভাষা ভিত্তিক আলোচনা, গবেষণা, অনুষ্ঠান করার প্রচুর সুযোগ তৈরি হবে। কাশী-তামিল সংস্কৃতির আদান প্রদানের মতো বাংলা-কাশী সংস্কৃতির আদান প্রদানের অনুষ্ঠান করা যেতেই পারে। দুর্গাপূজার ঐতিহ্যবাহী মর্যাদায় প্রাচীন বাঙ্গালির উপাসনা সংস্কৃতির গবেষণা, আলোচনার যেমন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাতে আরববাদীদের গাত্রদাহ হবেই, কিচ্ছু করার নেই। □

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিতে বাংলাভাষা আজ আভিজাত্যে অভিনন্দিত

ড. স্বপনকুমার মণ্ডল

অবশেষে এবছর (২০২৪) বাংলাভাষাও দেশের ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলেও বাংলাভাষার যথেষ্ট সমাদর ছিল। সেই আবহে উনিশ শতকে একা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা গদ্য ভাষাকে যেভাবে বনেদি আভিজাত্য প্রদান করেছেন, তাও ছিল এক ঐতিহাসিক বিস্তার; 'বঙ্গদর্শন'-এর মধ্যে তার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে। সেখানে বাংলাভাষার গুরুত্ব যেভাবে পরাধীন ভারতের মধ্যে প্রতীয়মান, স্বাধীন দেশে তার অভাববোধ অত্যন্ত প্রকট। দেশে ২০০৪ থেকে শুরু হওয়া ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিতে উপেক্ষিত বাংলা ভাষাকে এজন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল। তামিল, সংস্কৃত, তেলুগু, কানাড়া, মালয়ালমের পর ২০১৪-তে ওড়িয়াভাষাও ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই ওড়িয়ার স্বীকৃতি বাংলার উপেক্ষাকে আরও তীব্র করে তোলে। অবশেষে এবছর আরও চারটি ভাষার (মারাঠি, পালি, প্রাকৃত ও অসমীয়া) সঙ্গে বাংলাভাষার ধ্রুপদী স্বীকৃতিতে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরে পেল।

দেরিতে হলেও তার মূল্য কমেনি, বরং প্রতীক্ষার ফল আরও বেশি সুমিষ্ট মনে হয়। ক্ষুধাও খাদ্যকে সুস্বাদু করে তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই এতে ব্যর্থতাবোধে হীনম্মন্যতায় ভোগা বাঙ্গালির আত্মপরিচয় স্বরচিত উপেক্ষা আর অবজ্ঞার নামাবলিতে আর আত্মগোপন করে থাকতে হবে না। উলটে তার ব্রাত্য পরিসরে ধ্রুপদী ভাষার গরিমার আলো ছড়িয়ে পড়ার বিপুল সম্ভাবনা। বাঙ্গালির কাছেই ব্রাত্য বাংলা ভাষার আত্মপরিচয়ের সংকট নিরসনে তার ধ্রুপদী স্বীকৃতি যে অত্যন্ত জরুরি ছিল, তা তার বর্তমান অস্তিত্বেই প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি না পাওয়ায় বৈষম্যপীড়িত বাঙ্গালির মান-অভিমান নানা ভাবে মুখর হলেও তা কখনওই প্রতিবাদী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। সেখানে তার ব্রাত্য মানসিকতাই দায়ী। সেই ব্রাত্য পরিসর বাঙ্গালির স্বরচিত। সেখানেই বাংলা ভাষার আসল সংকট আত্মগোপন করে আছে। এবার তা থেকে বেরিয়ে আসার অবকাশ পেল। ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিই তার নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার অবকাশ এনে দিল।

এমনিতে বাৎসরিক আয়োজনেই বাঙ্গালির ভাষাপ্রেম উধাও হয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে আসে আর যায়। সবেতেই আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন, কৃত্রিমতার সঙ্গে আন্তরিকতার পার্থক্য নজর এড়ায় না। আসলে আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি। যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ-সূচক সম্মতি চোখেমুখে। বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙ্গালি বড়ো উদাসীন। প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তখন কখনওই গর্বের বিষয় নয়। 'আ মরি বাংলা ভাষা'র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙ্গালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে। প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য।

সেক্ষেত্রে বাঙ্গালির ভাষাজ্ঞান এখন ভাসা ভাসা। মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে। মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন

এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র। রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, 'মা হওয়া কী মুখের কথা / কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা' কথাটি ধ্রুব সত্য। জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে। সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না। সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ। পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে। অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি। অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে। আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙ্গালির মাতৃভাষা। বাঙ্গালির অস্তিত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে। বাঙ্গালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অম্পন্ন অধিকার।

অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত। বাংলাকে বাঙ্গালি মাতৃভাষার পরিবর্তে শুধু ভাষা করে তুলেছে। এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব। সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোধা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উলটে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়।

বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান। বাংলাভাষার সঙ্গে বাঙ্গালির মায়ের যোগ একুশে ফেব্রুয়ারি দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন। সেই মাতৃত্ববোধের অভাবে একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব বাঙ্গালির হৃদয়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয়। সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড়ো অভাব। 'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,/বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'র অন্ধ আনুগত্য বা 'তোমার গরবে, গরবিনী আমি,/রূপসী তোমার রূপে'র আত্মিকতা কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই; তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই। সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার। বাঙ্গালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন দেশের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাঙ্গালির ভাষায় উর্দু, আরবি, ফারসির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বাঙ্গালি তাই মাতৃভাষার মধ্যে নিজের ভাষা খুঁজে পায় না। শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙ্গালিই বাংলাভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে। আসলে বাঙ্গালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে। এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলাভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর 'মোদের গরব, মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা'র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না। সেখানে বাংলাভাষার দীনতা নয়, বাঙ্গালির মনের হীনতাবোধই দায়ী। শ্রদ্ধাবোধের অভাব বলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয়। সেই বাঙ্গালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না।

শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের মধ্যে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও ভালোবাসায় ধারণ করে চলে। সেখানে আমার মা আমারই মা-এর গৌরব আজীবন সৌরভ ছড়িয়ে যায়। সেই মা সবার থেকে ভালো কিনা বড়ো বড়ো কথা নয়, আমার কাছে বড়োর চেতনা সদা সক্রিয়। সেই সক্রিয়তার অভাবে বাংলা আজ সম্পদশালী ভাষা হলেও বাঙ্গালির মাতৃভাষায় গৌরবান্বিত হয় না। মায়ের গৌরব মাতৃত্বের বিস্তারে। আবার সেই মাতৃত্বের মহত্ত্ব প্রসব না করেও হতে পারে। মা-সারদার মতো সবার মা হওয়ার গৌরব শুধু সারদা মায়ের নয়, সমগ্র মাতৃকুলের। সেক্ষেত্রে একের মা অনেকের মা হতে পারে। আর তা হতে পারে মাতৃত্বের আপনত্ববোধে। বাংলাভাষাকে যদি অবাঙ্গালিদের মধ্যে মা বলে আপন করে নেয় বা নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তাহলে বাঙ্গালির মাতৃভাষার আসল সৌরভ প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। একের মা হওয়ার মধ্যে মায়ের স্বার্থপরতাই অনেকের মার হয়ে ওঠায় মহত্ত্বের আধার হয়ে ওঠে। এজন্য মায়ের মাতৃত্ব জরুরি। সবাইকে আপন সন্তানের মতো উদার অন্তর্দৃষ্টি সেক্ষেত্রে একান্ত কাম্য।

বাঙ্গালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙ্গালিদের মধ্যে এই প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালির উগ্রতা কাম্য নয়; প্রয়োজন আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ। যে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙ্গালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায়! সেক্ষেত্রে তার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি শুধু বাঙ্গালির গৌরবকেই ফিরিয়ে দেয় না, ঐতিহ্যপ্রাচীন অস্তিত্বে তার মাতৃভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলে। মাতৃভাষার সৌরভ ও গৌরব বিস্তারের ভিত্তিতেই ধ্রুপদী ভাষার আভিজাত্য বিস্তার। সেদিক থেকে আত্মসম্মানবোধে বাঙ্গালি তার মাতৃভাষার প্রতি আবার শ্রদ্ধাশীল হবে, নতুন করে আন্তরিকতায় নিজেকে খুঁজে পাবে, তার পরিমাণ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা নেতিবাচক ধারণার মধ্যেও বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বলে ওঠে। কেননা সম্মান বা স্বীকৃতি যে আত্মসমীক্ষায় আন্তরিক করে তোলে, আত্মসচেতনতায় গড়ে তোলে সশ্রদ্ধ সক্রিয়তা। সেদিক থেকে বাংলা ভাষা তার মাতৃত্বকে সঙ্গে নিয়েই ধ্রুপদী ভাষার রাজসিংহাসন অভিষিক্ত হবে, তা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

(লেখক প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়)

ধ্রুপদী বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার গুরুত্ব

ড. রাকেশ দাশ

দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বাংলাভাষাকে ধ্রুপদী মর্যাদা দেওয়া বাঙ্গালি জাতির পক্ষে এক বিশেষ গৌরবের মুহূর্ত। যদিও এই ঘোষণার আগেও বাংলাভাষার আরেকটি সরকারি স্বীকৃতি ছিলই। বাংলাভাষা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ত্রিপুরা, অসম ও ঝাড়খণ্ডের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভারত সরকার কর্তৃক একটি ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির লাভ সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবগত হয়েছি। অনেকগুলি সুবিধার মধ্যে একটি হলো, এই ভাষার সাহিত্য সর্জনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে। চিন্তার বিষয় হলো, এই সমস্ত পুরস্কার তাদের ঝুলিতে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা যারা বাংলাভাষার যথার্থ শত্রু।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বাংলাভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর হতে উদ্ভূত একটি ভাষা। কিন্তু এই ভাষা সংস্কৃতভাষা থেকে নির্গত। বাংলাভাষার অধিকাংশ শব্দ তৎসম অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃতভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে নেওয়া। কিছু শব্দ অর্ধতৎসম ও তদ্ভব। কিছু শব্দ নিছকই দেশি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন থেকে আধুনিক মহারথীরা প্রায় সকলেই সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বাঙ্গালির শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সংস্কৃতভাষাকে ব্রাত্য করে দেওয়ার অপচেষ্টা বাংলাভাষার যৎপরোনাস্তি ক্ষতিসাধন করেছে, এই নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলাভাষার চর্চা লুপ্তপ্রায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য বিভাগগুলিতে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ব্রাত্য। সেখানে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু মূলত 'সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি বর্তমানে বাংলা বিভাগে চলমান গবেষণা এবং বাংলা সাহিত্য পত্রিকাতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলি পরিশীলন করলে সহজেই এই সত্য উপলব্ধি করবেন। সর্বোপরি, বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নিয়োজিত কোনো পত্রিকার অস্তিত্বই নেই।

ঐতিহাসিকভাবে সুকুমার রায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে প্রথম বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার সূচনা করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন প্রমুখ সেই ভাষাতত্ত্ব চর্চাকে একটি সম্মাননীয় উচ্চতায় স্থাপন করেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু প্রমুখ বাংলাভাষার কোশশাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। যে কোনো ভাষার দীর্ঘজীবনের জন্য শব্দকোশের ভূমিকা অক্সিজেনের সমান। অন্যদিকে কোনো ভাষার ভাষাতত্ত্বের চর্চা সেই ভাষার সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। ভাষাতত্ত্ব ও কোশশাস্ত্রকে অবহেলা করার অর্থ সেই ভাষাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আশির দশকের পর থেকে বাংলাভাষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চা লুপ্তপ্রায়। বিগত তিন দশকে ভাষাতত্ত্ব চর্চার নামে বাংলায় 'বানান সংস্কার' নামক এক বাঁদরামি ছাড়া আর কিছুই হয়নি। দ্বিধাহীন ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এই কথা বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই যে, এই বানান সংস্কার বাংলাভাষাকে ধীরে ধীরে আরও ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে রামেশ্বর শ ও পরেশচন্দ্র মজুমদার ছাড়া অন্য কোনো মনীষীই বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় এক মুহূর্তও সময় ব্যয় করেননি।

বর্তমানে ১৯৭১-এ জন্মানো যে ভুঁইফোঁড় জাতি আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাভাষার অভিভাবকত্ব দখল করে বসে আছে, তারা বঙ্গ সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেয় না। তাদের আস্থা মরুদস্যুপন্থী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত ধরে অনুপ্রবেশ করা এক সংস্কৃতিহীনতার প্রতি দৃঢ়বদ্ধ, যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বঙ্গে প্রবেশ করেছে ত্রয়োদশ শতকে। বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ার অর্থ, বাংলা সাহিত্যের কমপক্ষে ১৫০০ বছরের ইতিহাসের স্বীকৃতি। অর্থাৎ বাংলাভাষার ইতিহাস এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বঙ্গে প্রবেশের অন্তত সাত শতাব্দী প্রাচীন।

> বর্তমানে বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির সঙ্গেই প্রকৃত বাঙ্গালির এই বিষয়ে বিশেষ অবধান দেওয়ার প্রয়োজন। অন্যথা ধ্রুপদী বাংলা ভাষার ভাগ্যলক্ষ্মী অচিরেই ছিন্নমূল হয়ে আগ্রাসী অপশক্তির কারাগারে বন্দি হয়ে পড়বে।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, বাঙ্গালি জাতি যখন তার ভাষার ইতিহাস ও পরম্পরা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছে তখন এই বাংলাভাষী হাইব্রিড সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিন্তু মনগড়া ভাষাতত্ত্বের চর্চায় এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসারে 'ইসলামিক' রাজশক্তি এবং তথাকথিত পণ্ডিতরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে আসাদুজ্জামান পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 'বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ'রা নিজেদের মনগড়া কল্পকাহিনিতে এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছেন অবিরত।

ঘোরতর চিন্তার বিষয় হলো, বিগত তিন শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালি বাংলা ভাষাতত্ত্বের চর্চা ভুলেছে, তখনই এই বাংলাভাষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের ধ্বংসাত্মক ভাষাতত্ত্বের চর্চায় অধিক মনোনিবেশ করেছে। ভাষাতত্ত্বের চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই তাদর মধ্যে বেড়েছে নতুন নতুন শব্দকোশ তৈরি করে ভাষার মূলকে ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাও।

বর্তমানে বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা প্রাপ্তির সঙ্গেই প্রকৃত বাঙ্গালির এই বিষয়ে বিশেষ অবধান দেওয়ার প্রয়োজন। অন্যথা ধ্রুপদী বাংলা ভাষার ভাগ্যলক্ষ্মী অচিরেই ছিন্নমূল হয়ে আগ্রাসী অপশক্তির কারাগারে বন্দি হয়ে পড়বে। □

বাঙ্গালি ও বাংলা ভাষার উৎস সন্ধানে

রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা বাঙ্গালি। ভাষাকে অবলম্বন করেই এক একটি ভাষা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে তাদের নিজের আচার ব্যবহার-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সাহিত্য— এক কথায় তাদের সভ্যতা। মন আছে বলেই মানুষ মননশীল। তার ভাব ও ভাবনার বিচিত্রতা মননশীল অনুভব ও বোধের মধ্য দিয়ে ক্রমাভিব্যক্তির পথে জন্ম দেয় ভাষা। বাংলাভাষার উদ্ভব ও তার বিকাশ জানতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে 'ভাষা' কী? মানব মনের বিবিধ ভাবপ্রকাশের তাগিদ থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' এ ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে--- 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে সুপ্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।'

বাংলা ভাষার মূল উৎস হলো সংস্কৃতভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোত্রে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাবিদদের মতে সংস্কৃতভাষা-সহ প্রাকৃত, অর্ধমাগধী ও পালির মতো ভাষা থেকে বাংলাভাষা এসেছে। এই প্রাকৃত ভাষা বলতে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে লোকমুখে প্রচলিত, সংস্কৃত হতে বিবর্তিত ভাষাগুলোকে বোঝায়। বাংলাভাষা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।

সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভব : সংস্কৃতভাষা হলো বাংলাভাষার আদি উৎস, যার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় বিবর্তনের অনেকগুলি স্তর অতিক্রান্ত হয়ে বাংলাভাষার জন্ম। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাভাষার জন্ম এবং এর প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত 'চর্যাপদ'।

প্রাচীন বঙ্গের আর একটি অর্থবহ নাম ছিল 'গৌড়'। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই 'গৌড়' শব্দটিকে 'বঙ্গ' শব্দের সমার্থক বলে মনে করতেন। বস্তুত বাঙ্গালির ইতিহাস লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোকশিল্পের, লোকসাহিত্যের ইতিকথার অন্য নাম।

উদ্ভব থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলাভাষার ইতিহাসকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

১. বাংলাভাষা (প্রাচীন যুগ) : সময়কাল-আনুমানিক ৯০০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ। নির্দশন : চর্যাপদ।

২. বাংলাভাষা (মধ্য যুগ) : এই স্তরের বাংলা ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) আদি মধ্যস্তরের বাংলাভাষা : সময়কাল-আনুমানিক (১৩৫০-১৫০০) খ্রিস্টাব্দ। নিদর্শন : বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা।

(খ) অন্ত্য মধ্যস্তরের বাংলা : সময়কাল-আনুমানিক (১৫০০- ১৮০০) খ্রিস্টাব্দ। নিদর্শন : মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্যের ভাষা।

৩. বাংলাভাষা (আধুনিক যুগ) বা আধুনিক বাংলাভাষা : সময়কাল- আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তরে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। নিদর্শন : ঊনবিংশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা থেকে বর্তমানকালের গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গান, বক্তৃতার ভাষা।

বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে বৃহত্তর অঞ্চলে বসবাস করে তার নাম বঙ্গদেশ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বঙ্গদেশ বলে কোনো প্রদেশ ছিল না; ছিল কেবল বঙ্গ। যা পরবর্তীতে 'বঙ্গদেশ' আখ্যা পায়।

সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দটি পাওয়া যায় তিন হাজার বছর আগের ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে। একশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈদেশিক রচনায় বঙ্গের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় গ্রিকদের লেখায়। তাতে বর্ণিত আছে গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে বসবাসকারী গঙ্গাহৃদি নামক জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা।

স্মরণাতীতকাল হতে বাঙ্গালি জাতি পরিচয়ের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয়। বৈদিক যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের যুগে রচিত নানা সাহিত্য নিদর্শনে বঙ্গভূমির উল্লেখ রয়েছে। গুপ্তরাজাদের সাম্রাজিক ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গরাজ্য ও উত্তরাঞ্চলের গৌড় রাজ্য। বৃহৎ বঙ্গের প্রথম এবং ঐতিহাসিক ভাবে সুনির্দিষ্ট এবং শক্তিশালী শাসক মহারাজা শশাঙ্ক আনুমানিক (৬০০ খ্রি.-৬২৫ খ্রি.) তাঁর দক্ষ শাসনের মাধ্যমে বাঙ্গালিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তখন থেকেই বাঙ্গালি জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ শুরু এবং পাল ও সেন যুগে এসে সে সত্তা আরও বিকশিত হয়ে বাঙ্গালি জাতির এক শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বৈদিক সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা ও স্রষ্টা মহর্ষি কপিলের আশ্রম রয়েছে বঙ্গভূমির সাগরতীর্থে। একটি ভূখণ্ড বা বিভাগ হিসেবে 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম এই তিনটি বিভাগ উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ অঞ্চল সুহ্ম বিভাগের অন্তর্গত। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন নাম সুহ্ম হলেও খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতক থেকেই সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে রাঢ় নাম চালু হয়। প্রাচীন বঙ্গের আর একটি অর্থবহ নাম ছিল 'গৌড়'। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই 'গৌড়' শব্দটিকে 'বঙ্গ' শব্দের সমার্থক বলে মনে করতেন। বস্তুত বাঙ্গালির ইতিহাস লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোকশিল্পের, লোকসাহিত্যের ইতিকথার অন্য নাম। □

ধ্রুপদীভাষা হিসেবে বাংলাভাষার স্বীকৃতি দেরিতে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

কোনো ভাষার সুনির্দিষ্ট কতগুলি বৈশিষ্ট্য তাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রদান করে। ধ্রুপদী ভাষায় প্রাচীনত্ব, লিপিবদ্ধ ইতিহাস কিংবা পাণ্ডুলিপির বয়স যদি ১,৫০০ থেকে ২০০০ বছর হয়; সেই ভাষার আদি সাহিত্যের একটি বিশেষ নমুনা যা কয়েকটি প্রজন্ম ধরে ওই ভাষার মানুষের কাছে মূল্যবান ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত। আদি ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট সেইমতো ভারত সরকারের ২০০৪ সালের ১২ অক্টোবর ঘোষিত এই মানদণ্ড অনুসারে তামিল ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

২০০৫ সালের ২৫ নভেম্বর নিয়মের পরিবর্তন করে ভাষার পাণ্ডুলিপি অথবা ভাষা ইতিহাসের বয়স ১০০০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৫০০-২০০০ বছর করে দেওয়া হয়। বাকি সব নিয়ম একই থাকে। সেই নিয়ম অনুসারে ২০০৫ সালে সংস্কৃত ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ২০০৮ সালে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় কন্নড় ও তেলুগু ভাষাকে। ২০১৩ সালে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে ঘোষিত মালায়ালাম ভাষাটিও দ্রাবিড়ীয় ভাষা বংশ থেকে উৎপন্ন একটি ভাষা এবং এর প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব ৮১৩ অব্দের। ওড়িয়াভাষাকে ২০১৪ সালে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেয় ভারত সরকার। এই ওড়িয়াভাষাকে বাংলাভাষারই নিকট আত্মীয় বলা চলে। ভাষা বংশ হলো পৃথিবীর ভাষাগুলির আদি রূপ, যা ভিন্ন ভৌগোলিক খণ্ডের মানুষের ভাষা।

২০২৪ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আইনের কিছু পরিবর্তন আনে। আগের আইনের তৃতীয় ধারায়— 'কোনো ভাষার সাহিত্যচর্চা মৌলিক হতে হবে এবং তা অন্য কোনো ভাষায় কথা বলা গোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করা যাবে না', অংশকে বাদ দেওয়া হলো। সাহিত্য অ্যাকাডেমির Linguistic Experts Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী ২০২৪ সালের ২৫ জুলাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব অমিতা প্রসাদ সরাভাই এক বিবৃতিতে বাংলা, মারাঠি, পালি, প্রাকৃত ও অহমীয়াকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। একইভাবে বাংলাভাষা আজ একটি 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা বহন করছে।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারত সরকার ২০০৪ সালে 'ধ্রুপদী ভাষা' মর্যাদার সূচনা করেছিল তাদের অন্যতম হলো— প্রতিটি ভাষার সঙ্গে তার অমূল্য ঐতিহ্য, সংস্কৃতি পরম্পরা নিহিত থাকে; সেই সব ঐতিহ্য চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আগে তাদের প্রচার ও দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যকে আরও শক্তিশালী করা। ধ্রুপদী ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং সাহিত্য চর্চার জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় অনুদানের সংস্থান রয়েছে। এটি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাদা বিভাগ গঠনের ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ। সেই ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সংস্থান।

ধ্বনি হলো ভাষার প্রাথমিক রূপ। মানুষের কতগুলি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরির সঙ্গে যুক্ত; যেমন— গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিভ, তালু, দাঁত ও নাক প্রভৃতি। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। একাধিক অর্থপূর্ণ শব্দের সমন্বয় হলো বাক্য। বাক্যের সমষ্টিই ভাষা। মানব বিবর্তনের ইতিহাসে ভাষা মানুষের মনের ভাব আদান-প্রদানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে জীবিত ভাষার সংখ্যা মোটামুটি ৬৯১২ এবং অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া ভাষা ৫১৬।

মানুষের ভাষক ক্ষমতার উৎপত্তি মানব বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। আধুনিক মানুষের বিবর্তন আজ থেকে প্রায়

ফঃ ৩

তিন লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা অঞ্চলে। এই অঞ্চল থেকেই তারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। তবে ভাষা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গের উপযুক্ত কাঠামো তৈরি হয় তার অনেক পরে, মোটামুটি এক লক্ষ বছর আগে। বিভিন্ন গুহাচিত্র ও শিলালিপিতে মানুষের ভাষার ব্যবহারের প্রমাণ মেলে— যা মানুষের ভাবের আদান-প্রদানের সহায়ক। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সব প্রাণী থেকে মানুষকে আলাদা করছে।

পৃথিবীর ভাষাগুলোর আদি রূপকে বলা হয় ভাষা বংশ। দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক খণ্ডের মানুষের ভাষা যখন এক হয়ে যায় তখন তাকে ভাষা বংশ বলে। 'ধ্রুপদী ভাষা' হিসেবে ঘোষিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ প্রথমে মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির পরিবর্তনের ভিত্তিতে ২টি গুচ্ছে ভাগ হয়ে যায়। যথা— কেন্তম গুচ্ছ ও শতম গুচ্ছ। যে ভাষাগুলিতে কণ্ঠধ্বনি থেকে গেছিল সেগুলি কেন্তম এবং যে ভাষাগুলিতে 'শ' বা 'স' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল সেগুলি শতম গুচ্ছ। ইউরোপীয় অঞ্চলের গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মানিক, কেল্টিক ও তোখারিও প্রভৃতি হলো কেন্তম গুচ্ছের ভাষা। অপরদিকে, বল্টো-স্লাভিক, আলবাণীয় এবং আর্মেনীয় প্রভৃতি ভাষাগুলো শতম গুচ্ছের। এই শতম ভাষাগুচ্ছ থেকেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বিবর্তন। শতম ভাষার প্রকৃতি প্রথমেই জাতি ভিত্তিক আলাদা হয়ে গেল; যেমন— আরব জাতি আরবীয় ভাষায়, মিশর জাতি মিশরীয় ভাষায়, ইরান জাতি ইরানীয় ভাষায় এবং বৃহৎ ভারতীয় ভূখণ্ডের মানুষের ভাষা ভারতীয় ভাষা। যা সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হয়েছে।

বাংলাভাষার উৎপত্তি সংস্কৃতভাষা থেকে। নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত, বাংলাভাষার উৎপত্তি 'সংস্কৃত' কথ্য রূপ 'প্রাকৃত' থেকে। এই কথ্য ভাষা প্রাকৃত আবার এলাকা ভিত্তিক ভিন্নতা তৈরি করেছিল। গৌড়ীয় এলাকার ভাষা ছিল গৌড়ীয় প্রাকৃত এবং মগধ এলাকার ভাষা ছিল মাগধী প্রাকৃত। ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলাভাষার উৎপত্তি মাগধী প্রাকৃত থেকে, আনুমানিক ১০ম শতকে। তবে ভাষাবিদ ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ ভিন্ন মতো পোষণ করে বলেন, বাংলাভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে ৭ম শতকে।

কথ্য ভাষা গৌড়ীয় প্রাকৃত এবং মাগধী প্রাকৃত একটা সময় এসে বিকৃত হয়ে যায়। ভাষার এই বিকৃত রূপকেই অপভ্রংশ বলে। ফলে মাগধী প্রাকৃত থেকে সৃষ্টি হলো মাগধী অপভ্রংশ এবং গৌড়ীয় প্রাকৃত রূপ নিল গৌড়ীয় অপভ্রংশে। বিভিন্ন ভাষাবিদদের গবেষণা থেকে জানা যায়, এই দুই অপভ্রংশের সমন্বিত রূপ থেকে সৃষ্টি হলো একটি নতুন ভাষা। যার নাম 'বঙ্গকামরূপী'। সুতরাং চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লিখিত পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি ধরলে বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটি ১৬০০ বছর। এরপরও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে গঠিত 'ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ'-এর দাবিপত্রে আরও কয়েকটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'বাঙ্গালিকে পেলেই বাংলার খোঁজ মিলবে'— এই ভাবনাকে সামনে রেখে বাংলাভাষাকে 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা পাওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পূর্ববঙ্গের বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা শিলালিপি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বঙ্গদেশ প্রসঙ্গ, সম্রাট অশোকের আমলে গিরনার শিলালিপি, সংস্কৃত-চীনা অভিযানে উল্লেখিত বাংলা শব্দ প্রভৃতির কথা।

বাংলা ছাড়া বাকি যে চারটি ভাষা যেমন— প্রাকৃত, পালি, অসমীয়া ও মারাঠি ভাষা 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা পেল সেগুলি এই ভাষা বিবর্তনের কোন স্তরে অবস্থান করে— তা বুঝে নেওয়া জরুরি। মধ্য ভারতে আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে সংস্কৃত ভাষার রূপ হলো প্রাকৃত ভাষা, যা কতকগুলি ভাষার সম্মিলিত রূপ। ১৮০০ বছরের এই প্রাকৃত ভাষার মোট তিনটি রূপ। আদিরূপ বা পালি, মধ্যরূপ বা প্রাকৃত এবং আধুনিক রূপ বা অপভ্রংশ। মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, অর্ধ-মাগধী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি হলো গৌড়ীয় প্রাকৃত। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্রের প্রাকৃত ভাষা হলো মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত। প্রাকৃতের পরবর্তী ধাপই অপভ্রংশ ভাষার সময়কাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে সপ্তদশ শতক। ভাষাবিদগণ যে গৌড়ীয় ও মাগধী অপভ্রংশের কথা উল্লেখ করেছেন তার সম্মিলিত রূপ 'বঙ্গকামরূপী' থেকেই ওড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া ভাষার উদ্ভব। ২০১৪ সালে ওড়িয়া যে 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা পেয়েছিল, ২০২৪-এ এসে বাংলা ও অসমীয়া সেই 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা পেল। অপরদিকে মারাঠিভাষার উৎপত্তি বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষার কথ্য রূপ প্রাকৃত থেকেই। মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত উদ্ভব হয়েছে মারাঠিভাষা। খ্রিস্টীয় ১ম ও ২য় শতকে সাতবাহন রাজ্যের সরকারি ভাষা ছিল এই মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত। ১৫শ ও ১৬শ শতকে এসে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত আধুনিক মারাঠিভাষার রূপ লাভ করে। অপরদিকে পালি ভাষা খ্রিস্টীয় ৩য় শতকে উৎপন্ন একটি ভাষা। ভাষা বিবর্তনের ধারায় এটি প্রাকৃত ভাষার ঠিক আগের রূপ। অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাকৃত'র মধ্যবর্তী ভাষারূপ হলো পালি। পালি শব্দটি সিংহলি। গৌতম বুদ্ধের সকল বাণী এবং পরবর্তীকালে অশ্বঘোষ-সহ অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতদের বাণী পালি ভাষাতে প্রচার হয়েছিল।

জীবিত সব কিছুরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, একটি জীবিত ভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য। বাংলাভাষা তার উৎপত্তির সময়কাল থেকে বিবর্তিত হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে পরিবর্তনের বাঁক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আরও এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে। ২৮ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা, ইউনেস্কোর হিসেব অনুযায়ী আজ বিশ্বের পঞ্চম ভাষা। বাংলাভাষার জন্য অসমের শিলচরে ১৯ জন বাঙ্গালির আত্মবলিদান, '৫২-র ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা প্রভৃতি এক গৌরবময় পরম্পরা। বাংলা সাহিত্য সারা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু কাজের সঙ্গে আবেগ, ব্যবহারের সঙ্গে ভালোবাসা এবং প্রচারের সঙ্গে অনুভবের পরিমিত ও উপযুক্ত সমন্বয় ছাড়া একটি ভাষা দিনে দিনে মৃতপ্রায় হতে বাধ্য। ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে ঘোষণা বাংলাভাষার অগ্রগতিকে আরও কিছুটা এগিয়ে দেবে, যদি তার সঠিক ব্যবহার আমরা নিশ্চিত করতে পারি। □

অতি আধুনিকতা নারী স্বাধীনতা নয়

সুস্মিতা সেন

স্বাবলম্বন আর স্বনির্ভরতা, অর্থাৎ আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া নারী স্বাধীনতার হয়তো কোনো অর্থই হয় না। শিক্ষায় ও সংস্কারে পরিপূর্ণ একজন নারী উচ্চশিক্ষিতা হয়ে তাঁর প্রগতিশীল চেতনা এবং উন্নত চিন্তাধারার মাধ্যমে সমাজকে চালনা করতে পুরোপুরি সক্ষম। সেখানে শালীনতা বজায় রেখেই স্বীয় কাজে ব্রতী হওয়া তাঁর ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। তাই প্রগতিশীল হলেও নিজস্ব মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বভার কিন্তু বর্তায় নারীদের হাতেই। প্রগতিশীলতা থাকা উচিত হৃদয়ে, চিন্তায় ও চেতনায়। শরীরে, পোশাকে তার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশে নয়। 'নারীবাদ' ও 'আধুনিকতা'র মোড়কে নিজেকে মুড়ে অতি-আধুনিকতার নাম দিয়ে নিজেদের সংস্কার ভুলে যাওয়া, মর্যাদার সীমা অতিক্রম করে সংস্কৃতিহীন হয়ে যাওয়া বা মাত্রাহীনভাবে অশালীন হয়ে পড়াটা আধুনিকতার মধ্যে পড়ে না, বরং সেটাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলা উচিত। আজকাল অনেক মহিলা এরকম জীবনযাপনে করতে উৎসাহী। নতুন প্রজন্মের মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

নারীদের আধুনিকতার ট্রেন্ড কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম। আজকাল চলছে 'অত্যাধুনিকতা'-র ট্রেন্ড, যাকে আধুনিকতা নয় বরং সমকালীনতা বলা যায়। আধুনিকতা আর সমকালীনতার মধ্যে তফাতটা আগে বোঝা দরকার। কলকাতার মতো মেট্রো শহরগুলিতে অনেক মহিলাই মদ্যপান এবং প্রকাশ্যে ধূমপান করেন। সেই সূত্রে পানশালা অর্থাৎ বার বা পাবগুলিতে তাদের অবাধ যাতায়াত। তাই এখন যত্র-তত্র গজিয়ে ওঠা রেস্টো-পাব, যেখানে বিভিন্ন কেতাবি খাদ্য ও পানীয় পাওয়া যায়, সেইগুলিতে একা বা তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে অনেক মহিলাকে যেতে দেখা যায়। ছুটির দিনগুলিতে অথবা কাজের দিনগুলিতে কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে সন্ধেবেলায় নিজেদের জন্য কিছুটা সময় নিজেদের মতো কাটানোর অছিলায় বা বিনোদনের আশায় হয়তো গড়ে ওঠে তথাকথিত আধুনিকাদের এই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক অভ্যাস। ইদানীং তারা কিন্তু কোনো পুরুষ সঙ্গীর অপেক্ষায় থাকেন না পানশালাগুলিতে যাওয়ার জন্য। এটা সমকালীন যুগের পরিমণ্ডল যা আজকের এই অতি-আধুনিকাদের মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে; বাঙ্গালি তথা ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে যার আরও বহু সময় লাগবে। পাশ্চাত্যধর্মী এই উগ্র আধুনিকতার সঙ্গে সামাজিক মেলবন্ধন না হওয়ার কারণে এই আধুনিকাদের অনেকেই দেখেছেন বর্তমান সমাজের এক নির্মম ও ভয়াবহ রূপ; সাক্ষী থেকেছেন চূড়ান্ত অমানবিকতার ও বিভীষিকার। শালীনতার সীমার মধ্যে যারা থাকছেন না, তাদের যেমন বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তেমনই যারা শালীনতা বজায় রেখে চলছে, তাদের একাংশও মাঝে মধ্যেই আক্রান্ত হচ্ছে এই সমকালীনতার দ্বারা। অত্যাধুনিকতার উগ্রতা সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় সমাজে এই দুই শ্রেণীর নারীদের ক্ষেত্রেই বিপদরেখা একই পরিমাপে রয়েছে।

পানশালা থেকে মদ্যপ অবস্থায় গভীর রাতে বেরোনো, যেখানে সেখানে সিগারেট খাওয়া, রাস্তায় স্বল্প পোশাক পরে বেরোনো, অচেনা পুরুষদের সঙ্গী করা, নিজেদের ব্যক্তিত্বকে তথা নারীত্বকে হারিয়ে ফেলছেন এমন নারীরা। তারা 'অত্যাধুনিক' হয়ে ওঠার ফলে সমাজে কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যায় যে মেয়েরা রান্না করতে পারে না, কারণ তারা রান্নাঘরেই কোনোদিন ঢোকেনি। বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়িকে বোঝা মনে করা এবং তাদের সঙ্গে একত্রে না থাকা, নিজেদের সুবিধার্থে তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে দায়ভার থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসিকতা আজকাল বহু নারীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে তারা এমনভাবে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে যে শুধু নিজেদের কথা ভাবা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার চিন্তা তারা করে না। অত্যাধুনিকতার এই প্রভাব যদি সমাজের উপর পড়ে, তাহলে তা শোভনীয় হতে পারে না।

গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে নারীরা নিজেদের ঘরে বন্দি না হয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখাপড়া শেখার মাধ্যমে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা চালিয়েছেন। তখন মহিলারা একা অথবা বান্ধবীদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। সেই সময় তাদের বিনোদন ছিল অন্যরকম। বান্ধবীরা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া, ফুচকা খাওয়া, কফি-হাউসে চা-কফি খাওয়া, কারোর বাড়িতে বসে গল্প করা, গান গাওয়া, একসঙ্গে উল বুনে সোয়েটারের নতুন ডিজাইন তৈরি করা, সেলাই শেখা, গান, নাচ, থিয়েটার বা গিটার শেখা, লাইব্রেরিতে একসঙ্গে বই আনতে যাওয়া, সেখানে বসে বই পড়া, গৃহশিক্ষকতা করা, সন্ধ্যার মধ্যেই কলেজ বা কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে ফিরে আসা, রান্না এবং ঘরের কাজে নিপুণ হয়ে ওঠা ইত্যাদি ছিল নারী জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বিষয়। আশি ও নব্বইয়ের দশকের নারীরা আরও একটু বেশি নিজেদের অবস্থানের উন্নতি সাধন করতে পেরেছেন। লেখাপড়া, গবেষণা, খেলাধুলা, চাকুরি, ব্যবসা, সিনেমা জগতে মেয়েদের অবস্থানের অনেক উন্নতি হয়েছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক সংগ্রাম চালিয়ে তখনকার নারীরা আজকের এই আধুনিক সমাজ এই প্রজন্মের নারীদের উপহারস্বরূপ দিয়েছেন। এই নারীরা সবাই নিজেদের যুগের আধুনিকা। পোশাকে নতুনত্ব এনেছেন, বই লিখেছেন, রাজনীতি-চাকুরি-সিনেমা-খেলার ময়দানে মাথা উঁচু করে চলার মতো ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, পরিবার- পরিজনদের নিয়ে একসঙ্গে থেকেছেন। সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। তাদের শিক্ষা ও সংস্কারেই জন্ম নিয়ে আজ অনেক গুণীজনরা বাঙ্গালি তথা ভারতীয় সমাজে সুশিক্ষিত, প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন।

আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালন করা হয় প্রতি বছর ৮ মার্চ। সারা বিশ্বে নারীদিবস শুধু নারী স্বাধীনতা উদ্‌যাপন নয়, নারী স্বাধীনতাকে সম্মান করারও প্রতীক। এটি এমন একটি দিন যখন নারীরা জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিভেদকে অতিক্রম করে তাদের কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃত হয়। সেই প্রথম বছর থেকে (১৯১০ সাল) আন্তর্জাতিক নারীদিবস উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মহিলাদের জন্য একইভাবে বয়ে আনে প্রগতিশীলতার বার্তা। বিশ্বজুড়ে এই তাৎপর্যবাহী দিনটি পালন আজ একটি সর্বাঙ্গীণ মাত্রা লাভ করেছে।

আজকের আধুনিকারা নিজেদের অবস্থান কোথায় সেটা নিজেরা বুঝে উঠতে পারছেন না। 'আধুনিকতা' বিশৃঙ্খলতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। মানসিক প্রগতিশীলতাই আধুনিকতা। সমকালীনতাকে যারা আধুনিকতার নাম দিয়ে সমাজের অকল্যাণ করছে, সংস্কৃতিকে দূষিত করছে, নিজেদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে—তাদের ভুল ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব ও গুরুভার রয়েছে এই প্রজন্মের মেয়েদের উপরেই। বর্তমান সমাজকে রক্ষা করে ভবিষ্যৎ সমাজ ও প্রজন্মকে তৈরি করার কাজ আজকের প্রগতিশীল ও আধুনিকা নারীদের। □

শিশু স্বাস্থ্যে স্মার্টফোনের কুপ্রভাব

ডাঃ বলরাম পাল

স্মার্টফোন শিশুদের জন্য কিন্তু ভীষণ রকমের ক্ষতিকারক। বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা শৈশব থেকেই স্মার্টফোনের সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা এটি ব্যবহারের মাধ্যমে গান শোনা, গেম খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট করা এবং সামাজিক মাধ্যম অনুসরণ করতে করতে বড়ো হয়। ঘটনা হলো স্মার্টফোনের সকল বিষয়বস্তু সব সময় শিশু-বান্ধব হয় না, ফলত, শিশুরা যখন স্মার্টফোন ব্যবহার করে তখন তাদের পিতা মাতা বা অভিভাবকরা তাদের সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে শিশুদের বিপথগামী হওয়ার প্রবণতা থেকেই যায়। আবার ফোন যেহেতু শিশুদের ব্যস্ত রাখে, তাই পিতা-মাতা এবং বাড়ির বয়স্করা এটিকে অনেক সময় সুবিধাজনক মনে করেন, কারণ তারা তাদের কাজ শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় পান। অভিভাবকদের বুঝতে হবে, দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে বাচ্চাদের চোখ, মস্তিষ্ক, মন এবং তাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে।

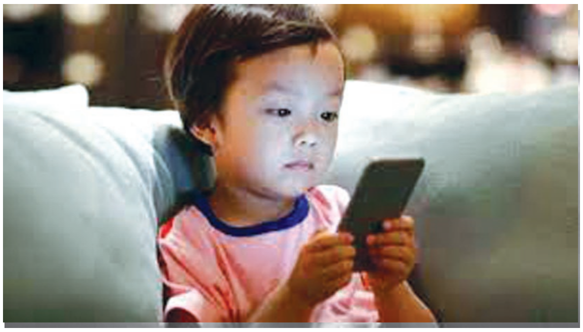

স্মার্টফোনের নেতিবাচক প্রভাব :

১. স্মার্টফোন রেডিওফ্রিকোয়েন্সি বিকিরণের মাধ্যমে যে সংকেত নির্গত করে তাকে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স বা ইএমএফ বলে। এই ইএমএফ থেকে যে রেডিয়েশন বা বিকিরণ হয় তা সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কে চলে যায় এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর একটি বিশাল প্রভাব ফেলে। শিশুদের বিকশিত হবার বয়সে তাদের হাতে, পকেটে বা ব্যাগে মোবাইল ফোন বহন করার ফলে অতিরিক্ত ইএমএফ এক্সপোজার হয় যা তাদের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। ডব্লুউএইচও বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধির মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে।

২. শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনে যে ভার্চুয়াল জগৎ দেখে তা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। শিক্ষার্থীরা এটিকে আকর্ষণীয় বলে মনে করে এবং এতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে। এটি তাদের পড়াশোনা ও খেলাধুলা থেকেও দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে তারা মনোযোগ হারাতে থাকে এবং ভীষণভাবে তাদের অ্যাকাডেমিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তারা অলস, জেদি আর একগুঁয়ে স্বভাবের হয়ে যায়।

৩. মোবাইল ফোনের দিকে অবিরাম তাকিয়ে থাকা দৃষ্টিশক্তি এবং চোখের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। চোখ শুকিয়ে যায় এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। শিশুদের পড়তে অসুবিধা হয়। এটি মোবাইল ফোনের সবচেয়ে খারাপ নেতিবাচক প্রভাবগুলির মধ্যে একটি।

৪. ক্রমাগত ফোন ব্যবহারের কারণে শিশুরা মাথাব্যথা এবং মাইগ্রেনে ভোগে।

৫. স্মার্টফোন ব্যবহার করতে করতে শিক্ষার্থীরা বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার থেকে দূরে চলে যায়, ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে।

৬. মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি এতটাই প্রবল যে তারা বেশিরভাগ সময়েই ফোন ছেড়ে থাকতে পারে না, এমনকী রাস্তায় হাঁটার সময় বা রাস্তা পারাপারের সময়ও। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

৭. ফোনে বেশি সময় ব্যয় করার ফলে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নির্গত রেডিয়েশন স্বাভাবিক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। সব থেকে বড়ো কথা, ফোন থেকে নির্গত নীলাভ আলো রাতেও মস্তিষ্ককে জাগ্রত রাখে।

৮. সারাদিন ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে এবং মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকার কারণে মাথাব্যথা, ঘাড় ও পিঠে ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে।

৯. ইন্টারনেটে অনেক সময় অনেক অনুপযুক্ত বিষয় এসে যায়, সেখান থেকে শিশুরা কোনটা সত্য আর কোনটা কল্পকাহিনি তার পার্থক্য করতে না পারার কারণে তারা নানা অসামাজিক ও অনৈতিক ক্রিয়াকর্মে প্রলুব্ধ হয়।

মোবাইল ফোন ব্যবহার কমানোর উপায় :

- শিশু বা শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার কমানোর অন্যতম উপায় হলো, বেশি ফোন ব্যবহার কীভাবে তাদের জীবনকে বিপথে নিয়ে চলেছে সে ব্যাপারে বুঝিয়ে বলুন। ফোন ব্যবহার একেবারে বন্ধ করার পরিবর্তে বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তাদের অবিহিত করুন।
- সাধারণ ফোন কলের পরিবর্তে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে যোগাযোগ বা লাউডস্পিকারে ফোন ব্যবহার করলে বিকিরণ এক্সপোজার থেকে মস্তিষ্ককে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- শিশুদের খেলাধুলা গান-বাজনা ইত্যাদি নানা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে রাখতে হবে।
- শিশুর পিতা-মাতারা অবসর সময়ে ফোন না ঘেঁটে বিভিন্ন বই এবং পত্র-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করুন এবং শিশুদের উপযোগী পাঠ্য তাদের পড়তে উৎসাহিত করুন।
- সন্তানদের কাছে টেনে একসঙ্গে বসে বিভিন্ন নীতিমালা, বোধ কথা, বীরগাথা ইত্যাদি বিষয়ে গল্প করুন।
- যেসব শিশু বা ছাত্র ইতিমধ্যেই স্মার্টফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে, তাদের এই আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজনে মনোবিদের সাহায্য নিতে হতে পারে।

যেভাবেই হোক শিশুদের থেকে স্মার্টফোনকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতেই হবে। আমরা যদি সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিই, তাহলে এই স্মার্টফোন তাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই মা-বাবার প্রতি অনুরোধ আপনাদের সচেতনতাই শিশুদের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। □

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সাধারণ সভা

গত ৪ থেকে ৬ অক্টোবর, মধ্যপ্রদেশের ভোপালে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কার্যকারিণী বৈঠক ও বার্ষিক সাধারণ সভা। এই সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রথম,উন্নত ভারত নির্মাণে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা। দ্বিতীয়, বিদ্যালয় সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষক সমাজ তীর্থক্ষেত্র হিসাবে মান্য করে এবং তৃতীয়, সারাদেশের শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যার সমাধান করা। বার্ষিক সভায় পরবর্তী তিন বছরের জন্য অখিল ভারতীয় নতুন কার্যকারিণী সমিতি ঘোষিত হয়। সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক নারায়ণ লাল গুপ্তা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অধ্যাপিকা গীতা ভট্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য মনোনীত হন। পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক হিসেবে আলোক চট্টোপাধ্যায় পুনরায় মনোনীত হন। সভার শেষদিনে তিন বিশিষ্ট শিক্ষককে অখিল ভারতীয় শিক্ষক সম্মান ‘শিক্ষা ভূষণ’-এ সম্মানিত করা হয়। বৈঠকে প্রদেশ থেকে ক্ষেত্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যালয় শিক্ষার রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক, অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক সৈকত মণ্ডল এবং উচ্চ শিক্ষার রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সঞ্জীব নাগ উপস্থিত ছিলেন।

গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৮ও ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ পরিচালিত গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচ, গান, নাটক, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে মাতৃশক্তির আরাধনা, দেশভক্তি, পরিবেশ সচেতনতার মতো নানান বিষয় উপস্থাপন করা হয়। ‘ভারতমাতার বীর সন্তান চুরকা মুর্মু’ নামাঙ্কিত অনুষ্ঠান মঞ্চে শারীরিক ও যোগ প্রদর্শন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের কাযকারিণীর সদস্য ড. অভিজিৎ সরকার, প্রাক্তন অধ্যাপিকা অশ্রুকণা দত্ত, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য বলরাম দাস, প্রধানাচার্য নির্মল দাস।

অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য অধিবেশন

গত ১৯-২০ অক্টোবর জলপাইগুড়ির মাষকলাইবাড়ি সারদা শিশু মন্দিরে সম্পন্ন হলো ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য অধিবেশন। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কুলকার্ণী, উত্তর ও উত্তর পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস ও পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক অনিল রায় এবং অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা রাজ্য সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল।

রাজ্যে কিষাণ সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা বিগত তিন বছরে ৪,০০০ যুক্ত হয়ে বর্তমানে তা ২৫,০০০-এর বেশি হয়েছে। প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ পাহাড়ি সদস্যতা অভিযানের গুরুত্ব ও জনসংযোগ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এইদিন শ্রীনিবাসজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'পঞ্চ পরিবর্তন'-র কাজে কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের কাছে আগ্রহ জানান। দীনেশ কুলকার্ণী বলেন, 'ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ আদর্শগত দিক থেকে অরাজনৈতিকভাবে কাজ করে চলেছে। সমাজে কৃষকদের বহু সংগঠন আছে, কিন্তু তারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৪ মার্চ, ১৯৭৯ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। সারাদেশে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪২ লক্ষে পৌঁছে গেছে।

অধিবেশনে ২০২৪-২৭ বর্ষের জন্য নতুন সমিতি গঠন করা হয়। সভাপতি অনিমেষ পাহাড়ি। সহ সভাপতি প্যারিচাঁদ ঘোরাই, পঙ্কজ কুমার বন্ধু ও পার্বতী সোলাঙ্কি। সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার এবং সম্পাদক কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস, ড. কল্যাণ জানা ও উৎপল কুণ্ডু। সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, কোষাধ্যক্ষ অষ্টগোপাল পাল। কার্যালয় প্রমুখ প্রসেনজিৎ নাথ। মহিলা প্রমুখ ড. অলি ব্যানার্জি। জৈব প্রমুখ ব্যোমকেশ রায়। যুব প্রমুখ গুপ্তেশ্বর চৌধুরী। প্রচার প্রমুখ ও 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক মিলন খামারিয়া-সহ আরও ৬ জন সদস্য নিয়ে মোট ২১ জনের সমিতি গঠিত হয়। অধিবেশনে 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যার উন্মোচন করা হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিল সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সমিতি।

ফারাক্কায় বাল্মীকি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১৭ অক্টোবর আদিকবি বাল্মীকি জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয় সাংগঠনিক রঘুনাথগঞ্জ জেলার ফারাক্কার মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের সভাগৃহে। অনুষ্ঠানে মাতৃশক্তি-সহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিজয় মহামন্ত্রের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ সম্পাদক অসীম রায় দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গৌতম সরকার বিজয়াদশমী থেকে লক্ষ্মীপূজা বা কোজাগরির বিষয়ের সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, রাষ্ট্রকে পরম বৈভবশালী করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের যোগদান আবশ্যিক, সেই হিসাবে বাল্মীকি, রবিদাস সমাজ-সহ সকলকেই অগ্রসর হতে হবে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বাল্মীকি সমাজের এক বন্ধু বিনোদ মল্লিক তাঁকে ডাকা ও সম্মান জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সমরসতা প্রমুখ কৌশিক চক্রবর্তী। ভারতমাতার আরতি এবং মহর্ষি বাল্মীকির চিত্রে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

গোপালী আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তীতে পদার্পণ

মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী সেবা প্রকল্প রূপে ১৯৭৪ সালে বিজয়াদশমী তিথিতে বালকৃষ্ণ উত্তমরাও নায়েক (কেষ্ট দা) প্রতিষ্ঠা করেন গোপালী আশ্রম। বিগত ৫০ বছর অনবরত সেবা কাজেব মধ্য দিয়ে এবছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করে।

বিজয়াদশমী তিথিতে সকাল ৮টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়। ১৫০টি কলস নিয়ে এই যাত্রার সঙ্গে বনবাসী নৃত্য, সংকীর্তন, দুর্গামাতার ট্যাবলো সহযোগে গোপালী থেকে আমড়াকোলা হয়ে শ্রীশ্রীওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে বাবা ভোলানাথের অভিষেক করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর প্রদীপ প্রজ্বলন, গৈরিক পতাকা উত্তোলন, বৈদিক যজ্ঞ, শস্ত্রপূজন, ধর্মসভা, ভক্তিগীতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। দুপুরে ৫০০ জনেরও বেশি একত্রে সহভোজ করে। জনজাতি ভাই-বোনদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ স্বপন মুখার্জী, পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ সহ সভাপতি দিলীপ ঝাঁওর, পরিষদেব প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মানিক পাল, পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর সদস্য সাধ্বী কল্যাণী প্রমুখ। ভূমিদাতা স্বর্গীয় হরিপদ ভঞ্জ ও রাধানাথ ভঞ্জের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উৎসব সমিতির সম্পাদক সুনীল কুমার করণ। আগামী বর্ষব্যাপী ১২টি কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ (২০২৪-২৫) পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জয়পুরে সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সভা

গত ১৯-২০ অক্টোবর রাজস্থানের জয়পুরে সম্পন্ন হয় সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সভা। এই সভাতে পরবর্তী তিন বছরের (২০২৪-২৭) জন্য নতুন সমিতি গঠন করা হয়। নবগঠিত সমিতিতে অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেহালাবাদক ড. মৈসুর মঞ্জুনাথ। তিনি বেহালাবাদক পণ্ডিত এস.মহাদেওপ্পার পুত্র তথা সুযোগ্য শিষ্য। ভারত সরকার প্রদত্ত সংগীত নাট্য অ্যাকাডেমির পুরস্কারে সম্মানিত।

সাধারণ সম্পাদক পুনরায় মনোনীত হন সুরবাহার বাদক ড. অশ্বিন এম. দলভী। উপাধ্যক্ষ হন বিশিষ্ট গবেষক চিন্তাবিদ রবীন্দ্র ভারতী, অভিনেতা নীতীশ ভরদ্বাজ, হেমলতা এস. মোহন। অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক অভিজিৎ গোখলে। এছাড়াও নবগঠিত সম্পাদক মণ্ডলীতে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে নীলাঞ্জনা রায়, মহারাষ্ট্র থেকে রবীন্দ্র বেডেকর, আশুতোষ আডোনী, ঝাড়খণ্ড থেকে সঞ্জয় চৌধুরী এবং দিল্লি থেকে অনুপম ভাটনাগর। আগামী তিনবছরের জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মঞ্চীয়কলা, দৃশ্যকলা, লোককলা, সাহিত্য ও কলা ঐতিহ্য--- এই ৫টি কলাবিধাকে অবলম্বন করে কাজের বিস্তার। দেশের প্রতিটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উৎসবগুলিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান তথা পালন। মাঘীপূর্ণিমায় 'ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী' এবং শ্রীগুরুপূর্ণিমায় 'নটরাজ পূজন' অবশ্য পালনীয়। ২৬ জানুয়ারি ভারতমাতা পূজন। সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়িতে পরিবার প্রবোধনের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ছটি গতিবিধির একটি পরিবার প্রাবোধনের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের কার্যকর্তাদের গত ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর দুদিনের প্রশিক্ষণ বর্গ সম্পন্ন হলো শিলিগুড়ির সেবক রোডের শতাব্দী সদনে। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংযোজক রবীন্দ্রএশঙ্কর জোশী। প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করেন উত্তরবঙ্গের সংযোজক রামেশ্বর পাল (সস্ত্রীক), মধ্যবঙ্গ সংযোজক সুব্রত সামন্ত এবং দক্ষিণবঙ্গ সংযোজক ওমপ্রকাশ রাওয়ত। এছাড়াও মালদা বিভাগ সংযোজক ভূপেশ বর্মন (সস্ত্রীক), রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা, আলিপুরদুয়ার জেলা সঙ্ঘচালক (সস্ত্রীক)-সহ ২০ জন পুরুষ ও ১০জন মহিলা কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বর্গে হিন্দু পরিবারের বর্তমান সমস্যা এবং তার সমাধানকল্পে বিস্তৃত চর্চা হয়।

প্রশিক্ষণ বর্গেরই অঙ্গ হিসেবে ২৯ তারিখে শতাব্দী সদন সারদা শিশুতীর্থে শিলিগুড়ি মহানগরের এক পরিবার মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুখ্য বক্তারূপে ছিলেন অখিল ভারতীয় সংযোজক রবীন্দ্রশঙ্কর জোশী।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক রামেশ্বর পাল, শিলিগুড়ি মহানগর সংযোজক রমেশ কল্যাণী এবং শিলিগুড়ি বিভাগ সঙ্ঘচালক উমেশ চন্দ্র বর্মন। মিলনে ৭০জন মাতা-ভগিনী, ৮০ জন পুরুষ এবং ২০জন শিশু, কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে।

'রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট'-এর আত্মপ্রকাশ

গত ১৪ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারসমূহকে নিয়ে কলকাতার ৬, চার্চ লেনে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিচারক এবং বর্তমানে ভারতে ইউনেস্কোর অফিসিয়াল পার্টনার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্টের গুডউইল অ্যাম্বাসাডর বিপ্লব রায়। তাঁর উদ্যোগেই এই অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করল একটি সংগঠন, যার নাম 'রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট'। এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী এবং এই সংগঠনের কার্যকর্তা হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন সুব্রত চাকী, কৌশিক দত্তগুপ্ত, সায়ন্তন বসু, শান্তনু মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল নন্দী, শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর কুমার কুণ্ডু, মিঠু চক্রবর্তী, রাজমোহন বৈরাগী, শুভম দত্ত-সহ আরও অনেকে। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নবনির্মিত সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী। সেক্রেটারি পদে যুগ্মভাবে নির্বাচিত হন আই.এন.এ-র সেনানী সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত। সংগঠনের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আগামীদিনে তাঁরা নিয়মিতভাবে মিলিত হবেন এবং ভারতের সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে, বিশেষত ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের জীবনী অনুসন্ধান করে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাকে পাথেয় করে ভারতের ইতিহাস পুনর্মূল্যায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে ডিসি অফিসে ডেপুটেশন

কলকাতার গার্ডেনরিচ, হাওড়ার শ্যামপুর, হুগলির চন্দননগর, বজবজের বাওয়ালি-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী দুষ্কৃতীদের দ্বারা দুর্গাপূজা মণ্ডপ এবং দুর্গাপ্রতিমা, লক্ষ্মীপ্রতিমা ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তর কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ডেপুটি কমিশনার) নর্থের অফিসে গত ১৯ অক্টোবর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে জমা দেওয়া হয় প্রতিবাদপত্র। সঞ্জয়ানন্দজী মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর কলকাতা জেলার সহ-সভাপতি মহাদেব পণ্ডিত, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ চৌধুরী, সহ-সম্পাদক কার্তিক শাসমল ও প্রদীপ ঘোষ, জেলার মাতৃশক্তি প্রমুখ গৌরী দাশগুপ্ত, জেলা ধর্মপ্রসার প্রমুখ শঙ্কর দে, জেলা সমিতির কার্যকরী সদস্য পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরানগর (পশ্চিম) প্রখণ্ডের সভাপতি মৃণাল ভট্টাচার্য ডিসি নর্থের অফিসে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

ভয়েস অফ হিন্দুস্থানের পরিচালনায় ‘শাঁখা-নোয়া হলো খালি—ছেচল্লিশের নোয়াখালী’

গত ২০ অক্টোবর কলকাতায় মানিকতলা-স্থিত রামমোহন লাইব্রেরি সভাকক্ষে সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ভয়েস অফ হিন্দুস্থান’ এবং একগুচ্ছ জাতীয়তাবাদীদের সমবেত পরিচালনায় আয়োজিত হয় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, ‘শাঁখা-নোয়া হলো খালি—ছেচল্লিশের নোয়াখালী’। ১৯৪৬ সাল হতে এখনও পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ঘটে চলা হিন্দু হত্যায় নিহতদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করে অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কাকদ্বীপ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী মহারাজ। তাঁর বক্তব্যে দুই বঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুর দুর্বিষহ পরিস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন মহারাজ।

ধর্মের উপর আক্রমণ, লোকক্ষয়, সম্পদহানি, ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের মতো বিপদগুলির উল্লেখ করে, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বাণী উচ্চারণ করে হিন্দুসমাজের সার্বিক জাগরণ এবং জেহাদি সন্ত্রাসের বিপ্রতীপে পালটা প্রতিরোধের উপরেই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রবক্তা আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী, ইতিহাস গবেষক স্নেহাংশু দাশগুপ্ত এবং বিশিষ্ট প্রকাশক অরিন্দম রায়। প্রধান বক্তা ছিলেন ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’-এর সাধারণ সম্পাদক এবং ‘কাঞ্জিক’ পত্রিকার সম্পাদক অনিমিত্র চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। নোয়াখালীর রক্তাক্ত ইতিহাস স্মরণ করে, তার পরবর্তী পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত দুই বঙ্গ জুড়ে ঘটে চলা হিন্দু নির্যাতন, হিন্দুনিধন পর্বের উপর আলোকপাত করে অনুষ্ঠানের সব বক্তাই তাঁদের বক্তব্যে হিন্দুসমাজের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

‘সৃজন-দ্য আর্ট অ্যাকাডেমি’-র নৃত্যানুষ্ঠান, ‘১৯৪৬-এর নোয়াখালী’ বইটির লেখক সন্দীপ মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সাগ্নিক সেনগুপ্তের যৌথ সঞ্চালনায় কুইজ প্রতিযোগিতা, নাট্যকার প্রবীর মণ্ডলের একাঙ্ক নাটক ‘ক্রান্তিকাল’ মঞ্চস্থ হওয়ার পর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন— সৌম্য মজুমদার, দেবারতি দাস ও ববিতা চক্রবর্তী ভৌমিক।

ফ : ৪

শিলিগুড়িতে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ'-এর বিষয়ে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১৮ অক্টোবর কলকাতা প্রেস ক্লাবে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজ, সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব মহারাজ-সহ বিশিষ্ট সাধুসন্তরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান যে আগামী ১৫ ডিসেম্বর (২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ; রবিবার,পূর্ণিমা তিথি) তারিখে ধর্মনগরী শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ'-এর অনুষ্ঠান। গীতা মনীষী পূজ্যপাদ জ্ঞানানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতিকে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ওই দিন শিলিগুড়ি শহরের কাওয়াখালি ময়দানে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ'-এর অনুষ্ঠান।

হিন্দুসমাজের সার্বিক জাগরণের লক্ষ্যেই আয়োজিত হতে চলেছে এই মহতী অনুষ্ঠান। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ধার্মিক হিন্দুকে এই কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার আহ্বান জানান সাধুসন্তরা।

জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে 'আজাদ হিন্দ দিবস' উদ্‌যাপন

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই দিন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন নেতাজী। গত ২১ অক্টোবর, কলকাতা-স্থিত আইএনএ মেমোরিয়ালে এই দিনটি উদ্‌যাপন করল জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ও জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে অভিবাদন (স্যালুট) জানিয়ে, 'জয় হিন্দ', 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি-সহ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত ভারত জননীর মহান সন্তানদের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। তাঁদের বলিদান-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য অবদানের কথা তাঁরা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে জয়শ্রী পত্রিকার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারক শান্তনু রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাধা চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মিঠু চট্টোপাধ্যায়; জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতির পক্ষে শান্তনু মুখোপাধ্যায় এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অনিমিত্র চক্রবর্তী, দোলন ঘোষ, শ্রীমান চক্রবর্তী, মৃণাল ভট্টাচার্য, শক্তিব্রত আর্য, স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাজী-অনুগামী। 'জনগণমন অধিনায়ক' গানের অনুবাদ INA-anthem সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রতিভা পুরস্কারে সম্মানিত হলেন কলকাতার তারা দূগড়

গত ২২ সেপ্টেম্বর সুরাটে আয়োজিত হয় জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থ ধর্মসঙ্ঘের সমারোহ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে একাদশমাধিশাস্তা যুগপ্রধান আচার্য মহাশ্রমণজীর উপস্থিতিতে কলকাতা মহানগরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সাহিত্য সম্পাদক ড. তারা দূগড় সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'সীতাদেবী সরাওগী প্রতিভা প্রতিভা পুরস্কার ২০২৪' প্রদান করা হয়। অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ মহিলা মণ্ডলের দ্বারা আয়োজিত ৪৯তম মহিলা অধিবেশনে সংস্থার অধ্যক্ষ শ্রীমতী সরিতা ডাগা ড. দূগড়ের হাতে মানপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট জন-সহ প্রায় কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মানিকতলায় মহর্ষি দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার মহর্ষি দধীচি ভবনে মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হলো মহর্ষি দধীচি জয়ন্তী। অনুষ্ঠানে মহর্ষি দধীচি ও মাতা দধিমতীর পূজার্চনা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারের মাধ্যমে করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পরমানন্দ তিওয়াড়ী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিসন গোস্বামী, পার্ষদ বিজয় ওঝা, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাপতি মহাবীর বাজাজ, উইপ্রো ফাউন্ডেশনের রাজকুমার ব্যাস প্রমুখ। মহর্ষি দধীচির জীবনের ত্যাগ ও চরম আদর্শের কথা উপস্থাপন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। অনুষ্ঠানে মেহেন্দী লাগানো, বাগ্মিতা, অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সঙ্গে মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয়।

আরজি কর হত্যাকাণ্ডের সার্বিক বিচারের দাবিতে সাধুসন্তদের অনশন

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার ছাত্রী তিলোত্তমার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার এবং দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গের দাবিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে 'অনশন অনুক্ষণ' কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন সাধু-সন্তরা। কলকাতাতে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে শ্রীধর জীউ মন্দিরের (২২৬এ, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৪) সামনে বম বম ভোলা পরিবার এবং মহাকাল নাথ যোগী সেনা সেবা সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা এই অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন। অনশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হিমালয়ের রুদ্রনাথ থেকে আগত সন্ন্যাসী কালিকানন্দ সরস্বতী মহারাজ। ভক্তদের কাছে 'বম বম ভোলা' নামেই তাঁর পরিচয়। রুদ্রনাথের দুর্গম অঞ্চলের একটি পার্বত্য গুহা তাঁর সাধনক্ষেত্র। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সন্ত মৃত্যুঞ্জয় নাথ মহারাজ। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ছিল তাঁদের অনশনের পঞ্চম দিন। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন বলে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুদূর রুদ্রনাথে সাধনরত একজন সন্ন্যাসী পশ্চিমবঙ্গের বুকে সংঘটিত নানা বীভৎস ঘটনায় বিচলিত। ধর্মের উপর বার বার আঘাত নেমে আসার কারণে অনশন-সত্যাগ্রহের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সাধনস্থল থেকে কলকাতায় এসে অন্য সাধুসন্তদের সঙ্গে তিনি এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। সন্তদের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তারা এই অনশন মঞ্চে প্রতিদিন হাজির হন। পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে চলা নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সন্তসমাজের প্রতিবাদের সাক্ষী থাকেন পথচলতি বহু মানুষ।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্মচারী সঙ্ঘের সদস্যরা গত ২১ অক্টোবর আসন্ন কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন উপলক্ষ্যে পার্ক স্ট্রিটের মেট্রো ভবনে মনোনয়নপত্র জমা করেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গাপূজায় বনগাঁ হীরালাল মূর্তি সংলগ্ন যশোর রোডে ভারতীয় সাহিত্য বিপণন কেন্দ্র। উদ্যোক্তা অজয় ঘোষ জানান, ৩৫ বছরে তিন লক্ষের বেশি বই এই বিপণন কেন্দ্র থেকে বিক্রি হয়েছে।

বাঁকুড়ার সরাক সম্প্রদায়ের বিস্তার এবং জৈন পুরাকীর্তির সন্ধান

বিপ্লব বরাট

প্রাচীনবঙ্গের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শাখা জৈন মতের অন্যতম কেন্দ্রস্থল বাঁকুড়া জেলা। লোকায়ত অঞ্চলে সরেজমিনে ক্ষেত্রসমীক্ষা- সহ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, রাঢ় বঙ্গের মধ্যভূমি বাঁকুড়াতে জৈন পরম্পরা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল অতি প্রাচীনকালেই।

'তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের স্মৃতি বিজড়িত পরেশনাথ পাহাড়ের অদূরে প্রসারিত পুরুলিয়া ও সন্নিহিত (বাঁকুড়া) অঞ্চলে জৈন মতের প্রসার ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের আত্মগত প্রশান্তি ও উত্তরণ রচনা করেছে এক মহিমাময় দিগন্ত, যা পূর্বভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক চিরন্তন প্রেরণাস্বরূপ।'

গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড উদ্ভূত ছোটোনাগপুর মালভূমির মধ্যে কাঁসাই তীরবর্তী অঞ্চলে শ্রাবক (সরাক) শিল্প ভাস্কর্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সারেংগড়। যা বর্তমানে মুকুটমণিপুর জলাধারে নিমজ্জিত। এখানে পুরীর রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন জৈন মতাবলম্বী। তাঁর সময়কাল কাঁসাই তীরবর্তী অঞ্চলে জৈন-দেউল ও তীর্থঙ্করের মূর্তি নির্মাণের প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। আর চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন জৈনপুরী ভদ্রবাহু, যিনি সম্যকজ্ঞানের অধিকারী হয়ে 'শ্রুতকেবলী' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল পৌন্ড্রবর্ধনের দেবকোট (বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়)। মহারাজ নন্দের সময়েও স্বাধীন কলিঙ্গদেশে জৈন মত-পথের প্রসার ঘটেছিল। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ডিহর, দামোদরের তীরে পখন্না থেকে শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের নিদর্শনের সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি পরীক্ষা করে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত এখানে অধিবসতির প্রমাণ মিলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, গাঙ্গেয় উপত্যকার মূল ঐতিহাসিক জীবনধারার সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল।

সরাকদের আদি বাসস্থান

তাম্রলিপ্ত বন্দর যা এখন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক যাবার প্রাচীন পথের পাশেই, বীরসিংহপুর, কোটালপুর, সানবাঁধা, রাজহাট, সান্তোড়, বাঁকী, বিকনা গ্রামগুলি হাজার দেড়হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে খুবই যত্ন নিয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানে এক অনালোকিত ইতিহাস উদ্ধার হয়েছে তা হলো, এককালে জৈন 'সরাক'দের বাণিজ্য ও ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এই রাজহাটের বিকনাতে। রাজহাটি, তাম্বলী, জৈন সরাক তন্তুবায়, ক্ষত্রিয় রাজপুতেরা এই বিকনা গ্রামকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে সরাকরা আদি বাসস্থান ও বাসভূমি ত্যাগ করে রাজস্থানের বিকানীরে বসতি গড়ে তোলে।

বহমান শিল্পধারা

প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষাতে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে জৈন শ্রাবক বা সরাক জাতির মানুষেরা খনিজ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এরা দীর্ঘকাল ধরে তামা উত্তোলন ও নিষ্কাশনের কাজ

করেছিলেন। সরাকী বাংলা তাম্র অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য। জৈন মতাবলম্বী সরাক মাঝিদের এখানে বসতির ফলে এই উপভাষার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সরাকেরা কেবলমাত্র তাম্র যুগেরই প্রবর্তক ছিলেন না, তাঁরা এই অঞ্চলে লৌহযুগেরও প্রতিষ্ঠাতা। জৈন সাহিত্যে প্রথম লৌহাচার্য ছিলেন মহাবীরের শিষ্য সুধর্মা। তিনি রাঢ়বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। জৈন শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ এই লৌহাচার্যকে লৌহ শিল্পের পণ্ডিত বা লৌহ শিল্পীদের আচার্য বলে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় লৌহাচার্য ছিলেন কল্পসূত্রকার ভদ্রবাহু। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার (History of Bengal Vol-1 PP.-409-10) ভদ্রবাহুকে রাঢ় বঙ্গের মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন।'

দামোদর তীরবর্তী রঘুনাথপুরের সরাকডিহি, মেজিয়া সরাকডিহি থেকে তাম্রাশ্মীয় কৃষ্ণ-লোহিত কৌলাল পাওয়া গেছে। বিকনার প্রাচীনতম বাসিন্দা জৈন সরাক বণিকেরা ছোটোনাগপুর মালভূমি, ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করেছিলেন। দেশজ ধাতুশিল্পে তামা ও লোহার পর তাঁরা মোম ও মাটির ছাপের কৌশল আরও বিকশিত করে ডোকরা শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

সরাক অধ্যুষিত ৩২টি গ্রাম

শালতোড়া থানার ১৮টি গ্রাম— লছমনপুর, খাগড়া, বারকোনা, বোজাপাথর, কাঁসাই, ছোলাইবাদ, সাহেবডাঙ্গা, মৌলাহিড়, লেদাপলাশ, সিদাবাড়ী, বেড়িয়াচোল, পাটদোহা, বিনোদড়ি, দিগতোড়, ঢেকিয়া, বিশজোড়, শালতোড়া ও পাবড়া।

গঙ্গাজলঘাটি থানার ১০টি গ্রাম— রাজালোস, গঙ্গাজলঘাটি, মল্লিকডিহি, চুড়রি, বালিখুন, ভক্তাবাঁধ, হাঁড়িভাঙ্গা, লছমনপুর, কেন্দ্রবনী ও ভুঁইফেড়।

মেজিয়া থানার গ্রাম ৩টি— কাঁসাই, দুপুড়িয়া, পায়রাশোল এবং ছাতনা থানার ১টি গ্রাম— জিড়রা। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী সরাক অধ্যুষিত এই সর্বমোট ৩২টি গ্রামের মধ্যে লেদাপলাশ, বেড়াথোল, গবেড়া, কাঁসাই, কানসাড়া ও পায়রাশোলে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বর্তমানে ১৫টি গ্রামে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের বাস। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী জৈনদের আটটি পরিবার বসবাস করেন। বাঁকুড়াতে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুটি শাখা বসবাস করে।

দেশাচার

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার নবদেউলভিড়াতে শ্রাবক বা সরাকদের প্রাচীন গ্রামটিতে এক দেশাচার দেখা যায়। নববধূ ও বরকে একটি দীঘিতে স্নান করানোর পর ধূপ-দীপ প্রজ্বলন করে 'জল সাওয়া' নামে একটি অনুষ্ঠান এখনো হয়। রাঢ় অঞ্চলে 'জল চল' নামক এই সামাজিক রীতিটি একেবারে জৈন প্রভাবজাত। গ্রামে জৈনমূর্তির সামনে এই অনুষ্ঠান হতো তা আজও বহাল রয়েছে।

দশলক্ষণ বা পর্যূষণ উৎসব

বাঁকুড়া জৈনদের দশলক্ষণ বা পর্যূষণ উৎসব পালিত হয়। শ্বেতাম্বর মতালম্বীদের ৮দিন ধরে এই উৎসব চলে। বাঁকুড়া মেজিয়া কাঁসাই ও শালতোড়া থানার লেদাপলাশ গ্রামে দশলক্ষণ উৎসব বিশেষ ভাবে পালিত হয়। বাঁকুড়া জেলার ৩২টি গ্রামে সরাকদের জাতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা আজও ধরে রেখেছে। তাদের মধ্যে ৬টি গ্রাম শ্বেতাম্বর মতাবলম্বীদের লোকাচার বজায় রেখেছে।

ধর্মাচরণ ও ধর্মবিশ্বাস

জৈন পন্থের প্রধান ১০টি লক্ষণযুক্ত পালনীয় ব্রতকেই দশলক্ষণ বা পর্যূষণ বলে। দশলক্ষণ উৎসব শুরু হয় শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে, শেষ হয় চতুর্দশীর শেষ লগ্নে। 'পর্যূষণ' মহাপর্ব (দশলক্ষণ মহাপর্ব) ৮দিন ব্যাপী হয়। শ্বেতাম্বরদের আগে আরম্ভ হয়ে শেষ হলে, দিগম্বরদের আরম্ভ হয়। জৈনধর্মের প্রধান ১০টি লক্ষণ— উত্তম ক্ষমা, উত্তম মার্দব, উত্তম আর্জব, উত্তম শৌচ, উত্তম সত্য, উত্তম সংযম, উত্তম অপ, উত্তম ত্যাগ, উত্তম আকিঞ্চন ও উত্তম ব্রহ্মচর্য।

লোকাচার

দশলক্ষণ মহাপর্বের সময় জৈনরা রাত্রে আহার করেন না, মাটির নীচে উৎপন্ন ফসল খান না। পূজার দ্রব্য— ছেঁকা জল, ছেঁকাজলে কেশর ও চন্দন মেশানো, আর অক্ষত-(সাদা আতপ চাল)। পুষ্প-আতপ চাল কেশর দ্বারা রাঙ্গানো। নৈবেদ্য-– নারিকেল দানা। দীপ— নারিকেল কেশর দিয়ে রাঙ্গানো। ধূপ লবঙ্গ দিয়ে। ফল— কাজু, পেস্তা, বাদাম, কিসমিশ, সুপারি, এই আটটি দ্রব্য একসঙ্গে মেশালে হয় অর্ঘ্য। কেশর-শিউলি ফুলের ডাঁটি। উপবাস করে অন্তিম দিনে ছোটো বড়ো সবার কাছে নতমস্তক হয়ে ক্ষমা আদান-প্রদান করে উপবাস পূর্ণ করা।

লৌকিক আচার অনুষ্ঠান

'শ্রবণকারী' সংস্কৃতি শব্দ থেকে শ্রাবক বা সরাক শব্দটি এসেছে। এর অর্থ গুরুর মুখ থেকে ধর্মশাস্ত্র শোনেন যিনি। (শ্রা (=শ্রদ্ধা) + ব (= বিবেক) + ক (= ক্রিয়া)। অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক বিবেকবান হয়ে যিনি ক্রিয়া করেন তিনি শ্রাবক।) জৈন মতাবলম্বী গৃহস্থ পুরুষদের শ্রাবক ও স্ত্রীদের শ্রাবিকা বলা হয়। এরা নিজের গৃহে থেকে গৃহ-সংসারী হয়ে সৎপথে জীবিকা অর্জন করেন। শ্রাবকেরা সাধারণত দ্বাদশ ব্রত পালন করে থাকেন। অক্ষয় তৃতীয়া জৈনদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিথি। ওই শুভ তিথিতে প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভদেব দীর্ঘ এক বছর উপবাসের পর ইক্ষুরস পান করে উপবাস ভঙ্গ করেন। বাঁকুড়া জেলার স্থানীয় সরাকেরা ওই দিন মাটির হাঁড়ি পূজা করে স্বচ্ছ জল রেখে ভগবান মহাবীরকে স্মরণ করে জল পান করেন। মহাবীরের জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ শোভাযাত্রা

বাঁকুড়ার বারকোনা গ্রামে দশলক্ষণ উৎসব।

সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়।

জৈন পরম্পরার মূল মন্ত্র—

১. অহিংসা পরম ধর্ম।

২. প্রাণীহত্যা না করা।

৩. সূর্যোদয়ের আগে না খাওয়া।

৪. বিয়েতে পণ না দেওয়া এবং পণ না নেওয়া।

৫. বাঁকুড়ার সরাক সম্প্রদায় বৈবাহিক সম্বন্ধ নিজ সম্প্রদায়ের পালটি ঘরেই করে থাকে।

৬. সরাকদের চেহারা সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত এবং মাথার চুল পিছনদিক থেকে উঁচু করে গুলি পাকিয়ে রাখে।

গোত্র

বাঁকুড়ার জৈন সরাক অধ্যুষিত গ্রামের সরাক সম্প্রদায় মূলত দুটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত— ঋষভদেব ও আদিদেব। শালতোড়া থানার বিশড়োড়া গ্রামের ১০টি পরিবারের ৮৫ জন লোক ঋষভ গোত্রের এবং বাকি সব সরাক আদিদেব গোত্রের। যাঁদের গোত্রের নাম আদিদেব তাঁরা প্রথম তীর্থঙ্কর আদিদেবের উত্তরসূরি। যাঁদের গোত্র অনন্তদেব তাঁরা চতুর্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তদেবের উত্তরসূরি। যাঁদের গোত্র ধর্মদেব তাঁরা পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্মদেবের উত্তরসূরি। যাঁদের গোত্র 'শাণ্ডিল্য', তাঁরা ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিদেবের উত্তরসূরি এবং যাঁদের কাশ্যপ গোত্র তাঁরা ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উত্তরসূরি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা

(বাঁকুড়ার তিনটি জৈন সরাক অধ্যুষিত গ্রাম)

ভক্তাবাঁধ গ্রাম

সমীক্ষার তারিখ ১৪.০৪.২০২২।

মৌজা-ভক্তাবাঁধ (জে.এল.নং-৮৬)। পঞ্চায়েত-ভক্তাবাঁধ। ব্লক- গঙ্গাজলঘাটি।

ভক্তাবাঁধের গাইঘাট হয়ে শালী নদী বড়জোড়া, বেলিয়াতোড় ও সোনামুখীর ভেতর দিয়ে ইন্দাসের সোমসার গ্রামের কাছে দামোদরের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়েছে। ভক্তাবাঁধে মল্ল আমলে ঘাটোয়ালেরা থাকতেন। ভক্তাবাঁধ হতে প্রাপ্ত তামার কুঠার বা কপার হোর্ড পাওয়া গেছে। প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ গ্রামটিতে সরাকজাতির প্রাধান্য লক্ষণীয়। ভক্তাবাঁধে সরাকদের উপাসনা স্থলে বিরাজমান মূল নায়ক— পার্শ্বনাথ, পূর্বমুখী দালান মন্দির।

জাতি	পরিবার
সরাক—	১০০ ঘর,
ব্রাহ্মণ—	৩০ ঘর,
বাউরী—	১০০ ঘর,
নাপিত—	২৫ ঘর,
বাগদি—	২০ ঘর,
ডোম (বাদ্যকার)— ২০,	
ক্ষত্রিয় (রায়)— ২ ঘর,	
ক্ষত্রিয় (সিংহ)— ১০ ঘর।	

উৎসব : মহাবীর জন্মজয়ন্তী, দশ লক্ষণ মহাপর্ব, অক্ষয়তৃতীয়া। চৈত্রমাসে রক্ষাকালীর বাৎসরিক পুজা ও উৎসব। চৈত্র, মাঘ, কার্তিক মাসে বিশেষ পূজা।

বিবাহ : আগে গঙ্গাজলঘাঁটি ব্লকের ১৮টি গ্রামের মধ্যে বিবাহ হতো, এখন শালতোড়ার পাশাপাশি বর্ধমান, পুরুলিয়া বা অন্য জেলার সরাকদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

জীবিকা : বেলমালা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই, এছাড়াও স্থানীয় মানুষ কৃষিকর্ম, ছোটো স্বনির্ভর ব্যবসা করে (সাক্ষাৎকার উত্তম মাঝি)।

রাজমেলা গ্রাম

সমীক্ষার তারিখ ১২.০৯.২০২১

থানা ও ব্লক গঙ্গাজলঘাঁটি। মৌজা— রাজা মেলা। (জে.এল.নং- ৬৪)। পোস্ট অফিস-বিশিন্দা।

শুশুনিয়া অঞ্চলে নবাশ্মর মসৃণ কুঠার যে সব অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম চাঁদরা, ধানকোরা ও বিশিন্দা। সরাক সংস্কৃতি বিদ্যমান এই প্রাচীন ঐতিহ্যময়ী রাজামেলা গ্রামটিতে। রাজামেলা গ্রামটি বিশিন্দা গ্রাম লাগোয়া নাচনচণ্ডী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং এখানে দেবী নাচনচণ্ডীর বিখ্যাত মেলা বসে। রাজামেলার সরাকদের

উপাসনা স্থলে বিরাজমান মূল নায়ক আদিনাথ পূর্বমুখী জৈন দালান মন্দির। দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত।

জাতি	**পরিবার**
সরাক—	১৬০ ঘর।
মহালী—	২৫ ঘর।
সাঁওতাল—	২২ ঘর।
নাপিত—	১ ঘর।
বাউরী—	১২০ ঘর।
ব্রাহ্মণ—	৪০ ঘর।

বিশেষ উৎসব : মহাবীর জয়ন্তী, উত্তম আর্জব ধর্ম এবং দিগম্বর সরাকদের সব উৎসবগুলো হয়। বসন্তে দোলপূর্ণিমার পর দিন থেকে তিনদিন নাচনচণ্ডীর মেলা বসে।

বিবাহ (দিগম্বর) : সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। বাঁকুড়া জেলার সরাক জৈনদের বিবাহের জন্য কোনো বরপণ লাগে না। মেয়েরা কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যায় না।

জীবিকা : বাঁশ শিল্প, চাকুরীজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষি কাজ।

(সাক্ষাৎকার লক্ষ্মণ চন্দ্র মাঝি। গোত্র— আদিদেব।)

বারকোনা গ্রাম

সমীক্ষার তারিখ ১২.০৯.২০২১

থানা ও ব্লক শালতোড়া। মৌজা বারকোনা (জে.এল.নং-১৫১)। কানুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত।

গ্রামটি প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ ও প্রাচীন। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি লৌকিক দেব-দেবী বিরাজমান। উপর পাড়াতে সরাকদের উপাসনা স্থলে বিরাজমান মূল নায়ক মহাবীর, উত্তরমুখী দেউল।

সরাক পাড়া ও নামো পাড়ার মাঝে একটি শিব দেউল বিদ্যমান। সনাতন সরাকসম্প্রদায়-সহ গ্রামের ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র সবাই এই শিব মন্দিরটিতে উপাসনা করে। পঞ্চরথ এই শিব দেউলটিতে একটি প্রতিষ্ঠা ফলক আছে। তা হলো—

শ্রীশ্রী গণেযেশ্বর শিব ঠাকুরজিউ।

দ্বিজ গণেশচন্দ্র পটনায়কর।

স্থাপিত শিবা শ্রঃ ১৮২০,

সন ১৩০৫ শাল তারিখ : ৩১ বৈশাখ।

বিপিনবিহারী মিস্ত্রী। স: শাহাপুর।

বারকণা।

বাঁকুড়া জেলার শাহাপুরের মন্দির নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পীদের আদি বাসস্থান ছিল এর থেকে প্রমাণিত হয়। শিল্পীর নাম গণেশ চন্দ্র পট্টনায়ক বাংলা ১৩০৫ সালে ইংরেজি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জাতি	**পরিবার**
ব্রাহ্মণ—	১৬ ঘর।
সরাক—	২৫০ ঘর।
বাউরী—	১৫০ ঘর।
তামুলি—	৬০ ঘর।
তাঁতি—	৫ ঘর।
গরাই—	৪ ঘর।

গ্রামের সরাকদের গোত্র আদিদেব।

উৎসব : দিগম্বর সরাকদের সব উৎসব পালন হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাজন প্রাচীন উৎসব।

বিবাহ : দিগম্বর সরাকদের মধ্যেই হয়ে থাকে।

জীবিকা : বেলমালা ও কাঠি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দিনমজুরি। এখানের সরাক সম্প্রদায় প্রধানত কৃষি নির্ভরশীল।

(সাক্ষাৎকার শক্তিপদ মাঝী। আদিদেব গোত্র।)

১২.০৯.২০২২।

এই তিন গ্রামেই জৈন মন্দির স্থাপন হয়েছে।

জৈন মতের পুনর্জাগরণের ফলে ১৯৯৩ সাল থেকে তার বিশেষ প্রভাব পড়ছে সরাক সমাজে। আচার্য ১০৮ শ্রীজ্ঞানসাগর মহারাজ সরাক সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। বাঁকুড়া জেলার সরাক অধ্যুষিত অঞ্চলে ১০টি দাতব্য পাঠশালাতে নিয়মিত পঠন পাঠন চলছে। ১৪টি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষীয় দিগম্বর জৈন ট্রাস্ট সরাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। এক কথায় সরাকদের জৈনপরম্পরার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার পূর্ণ প্রয়াস চলছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রচুর জৈন প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে ধারণা করা যায়, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে অরণ্যবাসী প্রকৃতিপূজক এবং সরাক জৈন মত-পথের মধ্যে বোঝাপড়া, সহযোগিতা, ধৈর্য ছিল; না হলে শ্রমণসংস্কৃতি একেবারে বিলীন হয়ে যেত। জৈনপরম্পরা এখনো টিকে আছে কারণ জৈনমতাবলম্বীরা রক্ষণশীল।

তথ্যসূত্র :

১. পুরুলিয়া জেলার পুরাকীতি : পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। অণিকা প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ:-৪৫।

২. সমকালীন সরাক-সম্প্রদায় ও তার ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার মাজী। মণিমোহন ফাউন্ডেশন প্রকাশনী। পৃ:-৩।

৩. বাঁকুড়ার সরাক সম্প্রদায় : মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়। সুচেতনা, শারদ সংখ্যা (১৪০৫)। পৃ:-২৮।

৪. বাঁকুড়ার ঐতিহ্যময় পুরাকীর্তি সন্ধানে : বিপ্লব বরাট (২০১৮)।

৫. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি (১ম খণ্ড, কলি-৯৯) পৃ:-৪০৯।

৬. প্রত্নকল্পতরু দ্বারকেশ্বর ক্ষেত্রসমীক্ষায় নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। লেখক- বিপ্লব বরাট। প্রকাশ-নিদর্শন সাহিত্য পত্রিকা ‘বাঁকুড়া।

সমীক্ষার সাথীর নাম ও সাক্ষাৎকার—

১. ভক্তাবাঁধ-সাথী-রবি অধিকারী। সাক্ষাৎকার-উত্তম মাঝী। ১৪.০৪.২০২২।

১. রাজামেলা-সাথী-বিকাশ বরাট। সাক্ষাৎকার-লক্ষ্মণ চন্দ্র মাঝী। ১২.০৯.২০২২।

৩. বারকোনা-সাধী-শক্তিপদ মাঝী। সাক্ষাৎকার জয়ন্ত মাজী ও লক্ষ্মণ মাজী। ১২.৯.২০২২। ☐

বঙ্গবিদ্যা চর্চার পরিধি ও পরিক্রমা

মহাশ্বেতা চক্রবর্তী

বর্তমান দেশীয় পরিস্থিতিতে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বঙ্গবিদ্যা চর্চা বলতে আমরা বুঝি একটি বিদ্যাচর্চা ক্ষেত্র যেটি বাঙ্গালি জনসমাজ, বঙ্গ সংস্কৃতি, বঙ্গ ভাষা, বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গ ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতা অধ্যয়নের জন্য নিবেদিত।

অধিকাংশ ভারতীয় বাঙ্গালি বাঙ্গালি সত্তার স্বরূপ সন্ধানে বিমুখ। জাতির জন্মগত পরিচয় যথেষ্ট নয়, তার বাঙ্গালি হয়ে ওঠা হোক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। তার নিজস্বতাকে ধরে রাখা এই সময়ে কঠিন একটি সাধনা। একমাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনবরত বঙ্গবিদ্যা চর্চার মাধ্যমে বাঙ্গালির একান্ত নিজস্ব হারিয়ে যাওয়া রত্নভাণ্ডারের সন্ধান সম্ভব।

বঙ্গবিদ্যা চর্চার ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখ হতে পারে :

- ইতিহাসের আলোকে বাঙ্গালি সত্তার বিবর্তনের সন্ধান।
- বাংলা ভাষার সৃষ্টি ও ভাষার যুগোপযোগী হয়ে ওঠার কঠিন সংগ্রাম।
- পুরাণের পাতায় বাঙ্গালির অস্তিত্ব।
- চর্যাপদ রচনার সময় থেকে রবীন্দ্র-উত্তর যুগের সাহিত্যে এবং বর্তমান সময়ের সাহিত্য রচনায় পরিবর্তন— উত্তরণ নাকি অবনমন!
- সুর-সংগীত চর্চাক্ষেত্রে বাঙ্গালি সত্তার স্বরূপ সন্ধান।
- শিল্পলোকে, বিজ্ঞান চর্চায় বঙ্গ ও বাঙ্গালির অসীম অবদান।
- যাত্রাপালা, নাটক, চলচ্চিত্র নির্মাণে বঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে, উৎসবে, পার্বণে বাঙ্গালির ঔজ্জ্বল্য।
- আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বঙ্গের দর্শন ও মহামানবিক শক্তি বিশ্বের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।
- সর্বোপরি রাষ্ট্রনির্মাণ ও পরিচালনায় বাঙ্গালি।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি বঙ্গবিদ্যা চর্চার পরিধি অতি বিস্তৃত। অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রদান করেছে। পাশ্চাত্য ভাষা ও আরবিক ভাষার প্রকোপ ও অপপ্রয়োগে প্রকৃত বাংলাভাষা হারিয়ে যেতে বসেছে। আশু বঙ্গের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রভূত চর্চা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'বাংলাভাষা প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে একটি সদর্থক দৃষ্টি থাকা জরুরি। একটি সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে, কত মাস বা কত বছরের মধ্যে কোন লক্ষ্যে আমরা উপনীত হবো। আগামী ১০ বছরের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রচনা করা দরকার।'

প্রকৃত বাঙ্গালিকে অঙ্গীকার করতে হবে, বঙ্গের বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম বঙ্গবিদ্যা চর্চায় অবিরাম রত থাকবে এবং গর্বিত বাঙ্গালি রূপে আত্মপরিচয় প্রদান করবে।

(ঋণ স্বীকার ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ)

শুদ্ধ ঘি দ্বারা নির্মিত মিষ্টান্ন এবং নোনতা খাবারের নির্ভরযোগ্য নাম

তিওয়ারি ব্রাদার্স মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী সহ যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে একসাথে ৪০ জনের বসার ব্যবস্থা

৭৮/১২, ব্লক-ই, নিউ আলিপুর : ৮৯৮১০২৬৯০৫/৯০০৭০৮৫১১১, ০৩৩-৩৫৯২৮৬৫৮

তিওয়ারি ব্রাদার্স, বড়বাজার : ৬২৯১২২৫৬৭০, ৮৯৮১০২৬৯০৬/০৩৩-২২৬৮৮৯১৩

তিওয়ারি সুইটস্, কটন স্ট্রীট : ৮৯৮১০২৬৯১১/৬২৯১১৮৩১৯৯

তিওয়ারি কনফেকসনার্স, মিন্টু পার্ক : ০৩৩-২২৮৭১১৬১/১১৬১/৫৬১৩, ৮২৭৬৮২৯৭৫২

কাকুড়গাছি : ০৩৩-২৩৫৫৮৩৭৩/ ৭৪, ৯০৩৮৪৮৮২১১

ফঃ ৫

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের ভাবনা

নিলয় সামন্ত

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, খেলোয়াড় হিসেবেও এটা শুনতে হয়েছে, এখন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে এই কথাটা আরও বেশি করে শুনতে হয়। সবার প্রশ্ন, ভারতীয় ফুটবল কেন এত পিছিয়ে? আইসল্যান্ডের মতো ছোট্ট একটা দেশ আমাদের থেকে ফুটবলে এগিয়ে।

উত্তরটা খুঁজতে গেলে একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। ভারত ১৯৫০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ পরের বছর দিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস হয়েছিল। সরকারের মনে হয়েছিল, এশিয়ান গেমসে জোর দেওয়া উচিত। ছয় দেশের এশিয়ান গেমসে ভারত সোনা পেয়েছিল। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ অলিম্পিক্সে ভারত ভালো খেলেছিল। তখনই আমরা পিকে, চুনী, বলরামকে দেখি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত কারণে আমরা বিশ্বকাপকে গুরুত্ব দিইনি। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল শুধু এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে। অনূর্ধ্ব–১৯ যুব এশিয়া কাপে ইরানের সঙ্গে ভারত যুগ্মভাবে সোনা পায়। কিন্তু ২০০২ সাল থেকে নিয়ম তৈরি হয়ে যায় অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারদেরই খেলানো যাবে। ২৩ বছরের বেশি বয়সের মাত্র তিন জন ফুটবলার খেলানো যাবে। ফলে বিশ্বকাপের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর বিশ্বকাপ না খেলায় ভারত ফুটবলের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে যায়। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভারত বিশ্বকাপ খেলার কথা ভাবেইনি। ১৯৮৬ সালে দিয়েগো মারাদোনাকে দেখার পর এ দেশের সরকার বা কর্তাদের উপলব্ধি হয় যে, বিশ্বকাপটাই আসল। বিশ্বকাপে খেলার আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু তত দিনে ভারত পিছোতে পিছোতে র‍্যাংকিঙে ৯০-১০০-১২০ তে চলে গিয়েছে। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। রিলে রেসে বাকি ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলোর থেকে তখনই দু'পাক পিছিয়ে পড়েছে ভারত। সবার আগে এই গ্যাপ ভরাট করার কঠিন কাজটা করতে হবে।

এর জন্য যত দ্রুত ফুটবলের ওই মূল স্রোতটায় ঢুকে পড়তে হবে। মূল স্রোত মানে শুধু বিশ্বকাপ খেলা বা প্রচুর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা নয়। ফুটবলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে। এই কারণেই বার বার ফিফা (বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা), এএফসি (এশীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা) কর্তাদের সঙ্গে দেখা করি। বিভিন্ন কনফারেন্সে যাই। প্রাক্তন কর্তাদের কাউকে ছোট না করেই বলছি, আগে কনফারেন্সে যাওয়া মানে পরিবার নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ, কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া ছিল। কিন্তু ওই কনফারেন্সগুলোকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সেগুলো কী করে কাজে লাগানো যায়, সারক্ষণ সেই ভাবনাটার মধ্যে থাকতে হবে। ফিফার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে। থাইল্যান্ডে দু'দিনের ফিফা কংগ্রেস ছিল। ফিফা সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করেছি। বিভিন্ন দেশের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। যতটা সম্ভব এই কনফারেন্সগুলোতে যাই, বিশ্ব ফুটবলের সঙ্গে যাতে আমাদের সম্পর্কটা ভালো হয়। সোজা কথা, নজরে থাকতে হবে। মাঠে সাফল্য আসাটা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এগুলো তো এখনই করা যায়।

পরের বিশ্বকাপে ৪৮টা দেশ খেলবে। এশিয়া থেকে খেলবে আটটা দেশ। ফলে সেই আটটা দেশের মধ্যে থাকতে হবে। ভারত এখন এশিয়ায় ১৮ নম্বরে। সেখান থেকে প্রথম আটে আসতে গেলে কী করতে হবে? যত বেশি সম্ভব খেলতে হবে। কোনও ফিফা উইন্ডো মিস করা যাবে না। তার পর দল যত জিতবে তত র‍্যাংকিঙে উন্নতি হবে। ফুটবলের (পাঁচ জন করে দু'দলের ইন্ডোর ফুটবল) মার্কিং প্রকাশ করেছে ফিফা (বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা)। ১৩৯টি দেশের মধ্যে ভারত ১৩৫ নম্বরে। কেন এত পিছিয়ে? তার কারণ ভারত খেলেই না ফুটবল। মূল ফুটবলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তা-ই।

বিশ্লেষণ করে কল্যাণ চৌবে বলেন, আমরা ফিফা র‍্যাংকিঙে ১০০ থেকে ১২০-তে নেমে গিয়েছি। কেন? আমরা ফিফা উইন্ডো ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারিনি। বছরে চার-পাঁচটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হতো। তাই র‍্যাংকিঙে উন্নতি হয়নি। সেই জায়গায় গত বছর ভারতীয় দল ২৫টা ম্যাচ খেলেছে। থাইল্যান্ড, মণিপুর, ভুবনেশ্বর, মালয়েশিয়ায় খেলেছে। কিন্তু আমাদের থেকে র‍্যাকিঙে নীচে থাকা মালয়েশিয়া, আফগানিস্তানের কাছে আমরা হারলাম।

যখনই নীচে থাকা দলের কাছে হারছি, র‍্যাংকিং আরও পড়ে যাচ্ছে। তাই ফিফা উইন্ডো ব্যবহার করার সময় স্ট্র্যাটেজিক্যালি এগোতে হবে। এমন দেশকে বাছতে হবে, যাদের সঙ্গে খেললে আমাদের উপকার হয়। অর্থাৎ, ম্যাচের সংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনই এমন দেশের সঙ্গে খেলতে হবে যেখানে সমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে।

কল্যাণ আরও বলেন, ফুটবলকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা সুনীলের। এটা সত্যি, আইকন না থাকলে জনমানসে সেই প্রভাব পড়ে না। সুনীল ১৯ বছর খেলছে। তখন কি ভেবেছিল এই জায়গায় পৌঁছবে? এটা সব ক্ষেত্রেই সত্যি। এক-দু'বছরে তো অমিতাভ বচ্চন হওয়া যায় না। এখন খেলোয়াড়েরা অনেক পেশাদার, সুশৃঙ্খল। ফলে আইকন অবশ্যই আসবে। কেউ না কেউ উঠে আসবেই। ছাংতে, মনবীরেরা এই জায়াগা যে নেবে না, কে বলতে পারে?

কল্যাণ যুক্তি দিয়ে বলেন, একটা সময় রাজ্যের ফুটবলে কলকাতা লিগই একমাত্র টুর্নামেন্ট ছিল। তিন প্রধান গুরুত্ব দিয়ে খেলত। এখন সেটা নেই। অথচ কলকাতা ফুটবল তিন প্রধান কেন্দ্রিক। এর বাইরে কোনও ক্লাবের সেই জনসমর্থন নেই। এটা একটা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি। প্রতিকূল পরিস্থিতি। আইএফএ যদি মনে করে ফেডারেশনের সহযোগিতা দরকার, আমরা করব। রাজ্যের ফুটবলের উন্নতি না হলে জাতীয় ফুটবলের উন্নতি হবে না। এটা আমাদের দায়িত্ব।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বলেন, আমার কেরিয়ারের শুরুর দিকে নিয়ম করা হয়েছিল বছরে ৪৫টার বেশি ম্যাচ খেলা যাবে না। প্রতিটা ম্যাচে টোকেন সই করে খেলতে হত। যে যত বেশি খেলবে তত পরিণত হবে। হারা-জেতার মধ্যে দিয়েই তো শেখা। চোটের কথা কোচেরা বলেন। কিন্তু কেউ তো প্র্যাকটিসেও চোট পেতে পারে। অমুক প্রতিযোগিতায় খেললে চোট লাগবে, অন্যটায় খেললে চোট লাগবে না, এ রকম তো নয়। খেলতে তো হবে। এটা মেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন কোচের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলে যায়। একটা সময়ে খেলোয়াড়দের তুলে নেওয়া হতো। পল্টু দাসের (ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন সচিব) মতো চরিত্র ছিলেন। উন্মাদনা ছিল। দলবদলের মজা ছিল। দলবদলের টোকেন নেওয়ার পর ফুটবলারদের আটকে রাখা হত। এখন যুগ বদলেছে। সিস্টেম বদলেছে। গোটা ফুটবল বিশ্বেই এটা হয়েছে। দলবদলে শান্তি, শৃঙ্খলা এসেছে। গোটা ব্যাপারটাই অনেক সংগঠিত হয়েছে। এটা মেনে নিতে হবে।

রাজ্য ফুটবল সম্পর্কে বলতে গিয়ে কল্যাণ আরও বলেন, এই রাজ্য আগে ভারতীয় ফুটবলের সাপ্লাই লাইন ছিল। আজ ভারতীয় দলে এক জন মাত্র বাঙ্গালি! এটা দুর্ভাগ্যজনক। বাঙ্গালি ফুটবলার কেন কমে গেল, এর কোনও তাৎক্ষণিক উত্তর আমার কাছে নেই। এটুকু বলব, প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়াতে হবে। বেশি ম্যাচ খেলতে হবে।

আমি ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসটা তুলে ধরতে চাই। একেবারে শুরুতে যে কথাটা বললাম, সেটা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। ফুটবলের ফাউন্ডিং মেম্বারদের মধ্যে না থাকাটা ভারতের জন্য বড়ো ক্ষতি। সাত জন সদস্য নিয়ে ফিফা শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে। আইএফএ (পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা) স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। ভাবুন! ফিফার থেকেও বয়সে বড়ো এই রাজ্যের ফুটবল সংস্থা। কিন্তু এই ইতিহাস, ঐতিহ্যটা কাজে লাগাতে পারেনি ভারতীয় ফুটবল। ভারত যদি শুরুতে কোনওভাবে মূলস্রোতে ঢুকে পড়তে পারত, প্রথম দু'-তিনটে বিশ্বকাপ খেলে ফেলত, ছবিটা অন্য রকম হতো। তখন ১৫-১৬ টা দেশ নিয়ে বিশ্বকাপ হতো। কে বলতে পারে, খেললে ভারত সেমিফাইনালে যেত না? ক্রিকেটে তো সেটাই হয়েছে। জেতার মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়, সেটা আর কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভারতীয় ফুটবল শুরু থেকে সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৮৩ সালে ক্রিকেট যেটা করেছে, ১৯৫০ সালে ফুটবল যদি করত, এই সমস্যা হতো না।

ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে কল্যাণ বললেন, সবার আগে বুঝতে হবে রিলে রেসে আমরা দু'পাক পিছিয়ে। আইএসএল তো কোনো অংশে কম নয়। আমি তো বলব, এশিয়ার ৪৭টা দেশের লিগের মধ্যে সেরা পাঁচে থাকবে। অন্তত বিনিয়োগের দিক থেকে। ২০১৪-র আগে দেখতাম মাঠের সেন্টার লাইনের পাশে ঘাস উঠে গিয়েছে। গোলকিপারদের জায়গাটা ন্যাড়া। এগুলো এখন দেখতে পাবেন না। আজ প্রতিটি মাঠ বিশেষভাবে তৈরি। পরিকাঠামোগত উন্নতি অবশ্যই হয়েছে। দুপুরের কাঠফাটা রোদে খেলা হচ্ছে না, দলগুলো বিলাসবহুল হোটেলে থাকছে। ট্রেনে যাতায়াত করতে হচ্ছে না, টেলিভিশনে সম্প্রচারের মান বেড়েছে। কিন্তু উন্নতিটা জাতীয় দলে প্রতিফলিত হচ্ছে না। কারণ বাকিরা বসে নেই। তারা দু'পাক এগিয়ে আছে।

ক্রিকেটের বড়ো সুবিধা সেখানে অর্থাভাব নেই। ফেডারেশন রাজ্যগুলোকে সাহায্য করতে চাইলে বা রাজ্যগুলো জেলাকে সাহায্য করতে চাইলেও যে খরচ তা বহন করার সামর্থ্য দরকার। আমাদের চেয়েচিন্তে এক-একটা প্রতিযোগিতা করতে হয়। শতাব্দীপ্রাচীন আইএফএ শিল্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আইএসএলের তো আমাদের টাকা দেওয়ার কথা নয়। টাকাটা যায় এফএসডিএলের (আইএসএলের আয়োজক) কাছে। ফেডারেশনের সরাসরি লাভ বা ক্ষতি নেই। এই সুযোগটা বাকি প্রতিযোগিতাগুলোয় আছে। কিন্তু আমরা করে উঠতে পারছি না। যেমন টিকিট বিক্রি থেকে লাভ, টেলিভিশন স্বত্ব বিক্রি। মেয়েদের লিগের টিকিটের টেলিভিশন স্বত্ব ৫ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে। আই লিগের জন্য যদি এটার ধারেকাছেও কিছু করা যেত! কোনো এক জায়গায় নিশ্চয় পিছিয়ে রয়েছি আমরা। ফুটবল ফেডারেশন সেভাবে ভাবেনি বা করেনি।

সব অলিম্পিক স্পোর্টসই কেন্দ্রের কাছ থেকে সাইয়ের মাধ্যমে সাহায্য পায়। এটাই

সিস্টেম। ক্রিকেট যদি অলিম্পিক্সের অন্তর্ভুক্ত হয়, বোর্ড চাইলে সেই সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারে। তবে আসবে কিনা সেটা ওদের ব্যাপার।

১৪২ কোটির দেশে কোনো একটি খেলা সব মানুষকে একসঙ্গে আকৃষ্ট করতে পারে বলে মনে হয় না। আমাদের থেকে অনেক কম জনসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন দেশ দিব্যি একাধিক খেলা খেলছে। ১০ কোটির নীচে জনসংখ্যা, এরকম ৫০-৬০টি দেশ রয়েছে। তারা কি একাধিক খেলা খেলে না? আমাদের দেশে ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলায় সেই আন্তর্জাতিক সাফল্য নেই। তাই ক্রিকেট জনপ্রিয়। ফুটবলের কিন্তু একটা স্বাভাবিক জনপ্রিয়তা আছে। ক্রিকেটের থেকে ফুটবল অনেক বেশি মানুষ ফলো করে। শহুরে বাচ্চাদের কাছে ক্রিকেটের থেকে ফুটবল বেশি আনন্দের।

আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সংশয় বা অনিশ্চয়তা নেই। ১০ বছর পূর্ণ করল আইএসএল— এফএসডিএলের সঙ্গে আগামী বছর আমাদের চুক্তি শেষ হচ্ছে। এটা সন্ধিক্ষণ, ট্রানজিশন পিরিয়ড। এই পর্যন্ত। কোনো অনিশ্চয়তা নেই। মহামেডানকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি ছাড়াই আইএসএল খেলতে দেওয়া হবে। টাকার বিকল্প আছে। কিছু টাকা কম পড়লে এদিক-ওদিক থেকে ম্যানেজ হয়ে যায়। জীবনে টাকাটাই সব নয়। কিন্তু যদি লক্ষ্যটাই শেষ করে দেওয়া হয়, তাহলে আর কিছু করার থাকে না। আই লিগ জেতার পর যদি আর সামনে কোনো লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তারা খেলবে কেন? আমার উদ্যোগে আই লিগে প্রমোশন চালু হয়েছিল। গত বছর পঞ্জাব এফসি, এবার মহামেডান উঠেছে। মনে হয় সব ফুটবলপ্রেমীরই খুশি হওয়া উচিত।

আইএসএলের জন্য ভারতীয় ফুটবলের ওপর থেকে ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে। এটা একেবারেই সত্য নয়। কাগজে-কলমে আইএসএল-সহ সব প্রতিযোগিতাই ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণে। শুধু মার্কেটিংটা এফএসডিএলের হাতে। যখন দরকার হয় আমরা আলোচনা করি। গত বছর রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। আমাদের চিফ রেফারিং অফিসার বিষয়টায় হস্তক্ষেপ করেছেন। ওঁর বেতনের অর্ধেকটা আমরা দিই, বাকিটা এফএসডিএল দেয়। পুরোটাই যৌথ প্রক্রিয়া।

নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, ফেডারেশন সভাপতি হিসেবে নিজের মূল্যায়নের জন্য আমি একটা রিপোর্ট তৈরি করেছি। আমার ১৮ মাসে কী হয়েছে, তার আগে কী হয়েছে। বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফিফা, এফসির সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। আর্সেন ওয়েঙ্গারের মতো কোচ ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। একাধিক ফিফা অ্যাকাডেমি তৈরি হয়েছে। আরও হবে। মহিলা ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা ১৩৮ শতাংশ বেড়েছে। 'ফুটবল ফর স্কুল'-এ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯১২ টা স্কুল যুক্ত হয়েছে। আমরা ১০ লক্ষ ফুটবল দিয়েছি স্কুলগুলোকে। পিটি-র টিচারদের ফুটবলের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ভারত গত বছর ২৫টা ম্যাচ খেলেছে। সেই সুযোগ করে দিয়েছি। হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে মেয়েদের লিগ করছি। আই লিগ-৩ শুরু করেছি। রাজ্য লিগগুলোতে বিদেশি ফুটবলারদের খেলা বন্ধ করেছি। নীচের স্তরে বিদেশিদের খেলা বন্ধ না করলে হবে না। গণ্ডগ্রামেও নাইজিরীয় স্ট্রাইকারকে খেলতে দেখেছি। সারা দেশে ১০ হাজার ক্লাব। চারটে করে স্ট্রাইকারের মধ্যে গড়ে তিন জন বিদেশি খেলত। এটা বন্ধ করেছি।

এআইএফএফ সভাপতি হিসাবে দশ বছর পরে যদি অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে ভারত যোগ্যতা অর্জন করে খেলতে পারে, সেটাই আমার সেরা সাফল্য হবে। এটাই লক্ষ্য স্থির করেছি। শুধু আয়োজক দেশ হিসেবে ভারত ছোটদের বিশ্বকাপে খেলুক, এটা চাই না। এটা করা সম্ভব। এই জন্য ভুবনেশ্বরে ফিফা অ্যাকাডেমি হয়েছে। ওয়েঙ্গারের তত্ত্বাবধানে যারা তৈরি হবে, তারা ওই বিশ্বকাপটা খেলবে। সেটাই আমার সেরা সাফল্য হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, জন্মেছিস যখন দাগ রেখে যা। সেটাই করব। যখন থাকব না তখনও মানুষ যেন মনে করে এই লোকটা সাধ্য মতো করেছে। রাজনীতি হোক বা ক্রীড়া প্রশাসন—এই দর্শনেই এগোতে চাই। এক একটা দিন ধরে, ছোট ছোট লক্ষ্য রেখে এগোতে চাই। প্রার্থনা করি, পরের দিনটা যেন আর একটু ভালো হয়।

প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলা শিবির-২০২৫

ব্রহ্মচারী শ্রীহৃষীকেশ মহারাজজী দ্বারা পরিচালিত শিবশক্তি সেবাধাম প্রতি বছরের মতো আগামী ২০২৫ সালে প্রয়াগরাজ পূর্ণকুম্ভমেলাতে শিবিরের আয়োজন করতে চলেছে। শিবশক্তি সেবাধাম যেভাবে অন্যান্য কুম্ভমেলাতে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও তীর্থভ্রমণের সুব্যবস্থা করে থাকে, সেভাবেই প্রয়াগরাজ কুম্ভমেলাতেও সমস্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। শিবির ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট হওয়াতে পুণ্যস্নান সহজ হবে। শিবিরের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক তীর্থযাত্রীরা অগ্রিম বুকিং করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। কুম্ভমেলায় সন্তভাণ্ডারা, ব্রাহ্মণভোজন ও সেবাদানের মতো পুণ্যকাজে দানধ্যান করতে ইচ্ছুক ভক্তরা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দান করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ফোনেও যোগাযোগ করা যাবে।

Google Pay/ PhonePe No.- 9451268600

D.47/49,Ramapura.(Opposite of Mazda Cinema Carparking), Varanasi (UP).

Mob. No. - **9451268600, 7985210182.**

Bank Account datails- Name— Hrishikesh Brahmachari.

A/C No - 34903180246. IFSC -SBIN0001190

State Bank of India (SBI), Varanasi, U.P.

বিঃ দ্রঃ- আধার কার্ড, পাসপোর্ট সাইজের দুটি ছবি এবং ১টি বিছানার চাদর সঙ্গে আনতে হবে।

বাঙ্গালির শ্বাসে-প্রশ্বাসে শ্রীরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। শ্রীরামচন্দ্রকে কোনো একটি রাজ্য বা এলাকায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর বিস্তার। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের হিন্দুর শ্বাস-প্রশ্বাসে শ্রীরাম। জনমেও রামনাম, মরণেও রামনাম। ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশের মানুষ তাঁকে একান্ত আপনার করে নিয়েছে। বাঙ্গালি যে শারদীয়া দুর্গাপূজায় মেতে ওঠে, তাও শ্রীরামের দান। তিনিই শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেছেন। অথচ বামমার্গী রাজনীতিবিদ এবং তাদের বশংবদ ইতিহাসবিদরা প্রচার করে চলেছেন শ্রীরামচন্দ্র বঙ্গদেশে বহিরাগত। বঙ্গজীবনের সঙ্গে তাঁর নাকি সম্পর্ক নাই। এই অর্বাচীনদের তো ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় নেই। থাকলে তারা জানতে পারতেন, অযোধ্যার রাজা দশরথের সাম্রাজ্যভুক্ত এই বঙ্গপ্রদেশও ছিল। তারা জানার চেষ্টা করেননি যে, কৃত্তিবাস ওঝা কীভাবে শ্রীরামকে বাঙ্গালির একান্ত আপনার জন করে দিয়েছেন। বামমার্গীদের অপপ্রচারে বাঙ্গালি বিভ্রান্ত না হলেও ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞান না থাকা কতিপয় বাঙ্গালি হয় বটে। এরকম বাঙ্গালির বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য বহু গবেষক গবেষণা করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাঙ্গালির সঙ্গে শ্রীরামের সম্পর্ক। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস স্বস্তিকা পত্রিকায় এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, এই পশ্চিমবঙ্গেই কমপক্ষে ৩৪টি শ্রীরাম মন্দির রয়েছে, যা তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো। শ্রীমতী অনিতা বোসের সম্পাদনা ও সংকলন ‘বঙ্গভূমিতে রামায়ণ চর্চার ঐতিহ্য’ গ্রন্থেও রয়েছে এর বহু প্রমাণ। এটি একটি গবেষণা গ্রন্থ। কিন্তু অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় অতি সাধারণ বাঙ্গালির কাছে শ্রীরামচন্দ্র ও বাঙ্গালির সম্পর্ক উপস্থাপন করেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণব পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ তাঁর ‘বঙ্গদেশে শ্রীরামচন্দ্র’ গ্রন্থে। মাত্র ষাটপৃষ্ঠার একটি পুস্তকে শ্রীরামচন্দ্র কীভাবে বঙ্গজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তার বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। শ্রীরামের নামে এই পশ্চিমবঙ্গে জেলায় জেলায় কত গ্রাম রয়েছে তারও পরিসংখ্যান দিয়েছেন। কত বাঙ্গালি যে রামের নামে নাম রাখেন তারও উল্লেখ করেছেন। পূর্ববঙ্গে রাম শব্দযুক্ত ৩৪টি গ্রামের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯টি শ্রীরাম মন্দিরের শ্রীরামবিগ্রহের চিত্রও পুস্তকটিতে সংযোজন করেছেন। স্বল্প পৃষ্ঠার বইটি সত্যিই সুখপাঠ্য। স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত সরলভাবে করেছেন, এজন্য বাঙ্গালি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল মনে রাখবে।

গত ৪ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় সঙ্ঘ কার্যালয়ে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়। স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈত চরণ দত্ত। অনুষ্ঠানে স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ পুস্তকটির বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। শ্রীদত্ত সকলকে অনুরোধ জানান পুস্তকটি সংগ্রহের জন্য। অনুষ্ঠানেই শতাধিক পুস্তক বিক্রি হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ সুব্রত রায়।

পুস্তকের নাম : বঙ্গদেশে শ্রীরামচন্দ্র।
লেখকের নাম : স্বামী যুক্তানন্দ।
প্রাপ্তিস্থান : ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বালিগঞ্জ, কলকাতা।
প্রণামী : ২৫ টাকা।

উপহার

রাহুল তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে নিল। আজ যে তার জন্মদিন। সকাল সকাল দাদু-ঠাকুমা বাবা-মাকে প্রণাম করতে হবে। ব্যাঙ্গালোর থেকে মামা প্রতিবারই উপহার পাঠায়। একটু বেলা হলেই পোস্টম্যান এসে

উপহারের প্যাকেট পৌঁছে দিবে।

রাহুল সকালের জলখাবার খেয়ে একটা বাটিতে ছোলা নিয়ে উপরে গেল তার প্রিয়বন্ধু সিন্ধুর কাছে। সিন্ধু তার পোষা কাকাতুয়া। খাঁচার কাছে যেতেই পাখিটা বলে উঠল—

'আমার নাম সিন্ধু, রাহুল আমার বন্ধু'

এমন সময় নীচ থেকে ডোরবেলের আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ডাক। এক দৌড়ে রাহুল নীচে গিয়ে দেখে মা হাতে একটা পার্সেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। উপহার চলে এসেছে। সেটা তখনই খুলে দেখে একটা বাংলা গল্পের বই।

রাহুল গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসে। স্নান-খাওয়া সব সেরে বইটা নিয়ে বসে পড়ল। প্রথম গল্প লেখা রয়েছে 'পাখির জীবন ভিক্ষা'। তাতে লেখা হয়েছে, একদিন এক শিকারি জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এক সুন্দর পাখি জালে বন্দি করে ফেলে। সেই পাখিটার মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু, তাই শিকারি তার ছেলে-মেয়ের

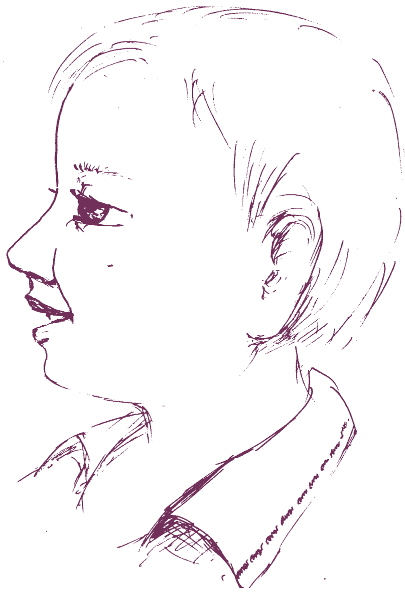

কথায় পাখিটা কেটে ফেলার উপক্রম করছিল। সেটা বুঝতে পেরে পাখিটার চোখ থেকে জল পড়ে। মনে হয় যেন জীবন ভিক্ষা চাইছে তার ছানাগুলোর জন্য। শিকারি তাতে কোনো পাত্তা না দিয়ে পাখিটাকে কেটে ফেলে।

গল্পটা পড়ে রাহুল কেঁদে ফেলল। কারণ সেও তো একটা পাখিকে বন্দি করে রেখেছে। তার শরীরে আঘাত না করলেও তার মনে তো আঘাত করছে। তারও তো পরিবার ছিল, তার তো খোলা আকাশে মনের আনন্দে উড়ে বেরানোর কথা, কিন্তু আমাদের

কারণেই তো পাখিটা ছোট্ট একটা খাঁচায় বন্দি।

সেদিন দুপুরে শুয়ে পড়লেও সারাক্ষণ কাকাতুয়ার কথা ভেবে রাহুলের ঘুম এল না। উঠে গিয়ে কাকাতুয়ার খাঁচাটার পাশে দাঁড়ালো আর বলল, 'জানিস সিন্ধু, আমার মামা আমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়েছে, তোরও উপহার চাই নাকি?' আজ আমি তোকে উপহার দিতে চাই রে।

খাঁচাটার দরজা আস্তে করে খুলে দিল। পাখিটা বেরিয়ে জানালায় গিয়ে বসল। রাহুল বলল, 'আমার জন্মদিনে তোকে এই উপহার দিলাম, তুই এখন স্বাধীন। যা, উড়ে যা খোলা আকাশে।' কাকাতুয়া ডানা মেলে উড়ে গেল নীল আকাশে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এটা দেখে আট বছরের ছোট্ট রাহুলের মন আনন্দে ভরে উঠল। তারপর বইটা যত্ন করে রেখে দিল।

পরদিন সকালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন ডাকছে, 'রাহুল রাহুল।' জানালায় তাকিয়ে দেখে তারই প্রিয় বন্ধু সিন্ধু। দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ছোলা এনে বন্ধুকে খেতে দিল। রাহুলের মনে হলো, তার বন্ধু মুক্ত হলেও সে তাকে ছেড়ে যায়নি। এমন করেই চলতে থাকে দুই বন্ধুর প্রতিদিনের সাক্ষাৎ। সিন্ধু প্রতিদিন সকালে আসে আর গান শোনায়—

'আমার নাম সিন্ধু, রাহুল আমার বন্ধু'

রূপসা রায় (নবম শ্রেণী)

জাতীয় উদ্যান

সুন্দরবন

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গঙ্গা উপকূলে অবস্থিত হলেও এই বনভূমি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত। দশহাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের প্রায় ৬৫১৭ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে। বঙ্গোপসাগরের ৭৫ মিটার পর্যন্ত জোয়ার এখানে সবসময় দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭৩ সালে **সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প** হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৭৮ সালে ভারতীয় অংশে সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে অভয়ারণ্যের মর্যাদা পায়। ১৯৮৪ সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষিত হয়। গোটা সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সামুদ্রিক খাড়ি। রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানা রকমের পাখি, চিতা হরিণ, কুমির, কচ্ছপ, সাপ-সহ নানা প্রজাতির প্রাণী।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৪৩

ঘড়ি দেখে সময়জ্ঞান-২

সপাদ—সোয়া

কঃ সময়ঃ ? **(কটা বাজে?)**

5.15 সপাদ-পঞ্চবাদনম্ **(সোয়া পাঁচটা)**

6.15, 7.15, 8.15,

9.15 সপাদ-নববাদনম্

10.15, 11.15, 12.15,

পাদোন--পৌনে

কঃ সময় ?

4.45 পাদোন পঞ্চবাদনম্ **(পৌনে পাঁচটা)**

5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45,

10.45 পাদোন একাদশবাদনম্

11.45, 12.45

('ঘড়িতে সময় দেখে সময়জ্ঞান' পাঠটিতে লেখার চেয়ে বলার গুরুত্ব বেশি। তাই ঘড়ি দেখে বারবার বলার অভ্যাস করতে হবে)

ভালো কথা

জন্মদিন

গত ২১ অক্টোবর আমাদের দেবুদার জন্মদিন ছিল। ওইদিন সকালেই আমি আর আমার দাদা দেবুদাকে ফোনে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমার মা-বাবাও জানিয়েছেন। দেবুদা শাখার সব ভাই-বোনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সন্ধ্যায় আমি আমার দাদার সঙ্গে আমার হাতে বানানো শুভেচ্ছাপত্র (গ্রিটিং কার্ড) নিয়ে ২৬ নং সঙ্ঘ কার্যালয়ে গেলাম। ততক্ষণে সব দাদা-ভাই এসে গেছে। দেবুদাকে একটা আসনে বসিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, ফুলের মালা পরানো হলো। একটি প্রদীপ জ্বালানো হলো। শঙ্খ বাজিয়ে দেবুদাকে আরতি করে বড়োরা পায়েস খাইয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমরা ছোটোরাও পায়েস খাইয়ে দিলাম। আমি দেবুদার হাতে আমার বানানো কার্ডটি দিলাম। উনি খুব খুশি হয়ে আমাকে আদর করলেন। আর ছোটোদের হাতে টফি দিলেন। শেষে সহনদা আর সৈকতদা সবার হাতে পায়েস ও মিষ্টির বাটি ধরিয়ে দিলেন। দেবুদার জন্মদিনে খুব আনন্দ হলো।

শ্রেয়া রজক, পঞ্চমশ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

দানা

কাকলি চন্দ, একাদশ শ্রেণী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

ডানা ঝাপটে আসছিল দানা
ভয়ে সবাই জড়োসড়ো,
ওড়িশা চাটগাঁ বাদই দিলাম
কলকাতাও ছিল মরো মরো ।
ইলশেগুড়ি বৃষ্টিই শুধু
সঙ্গে একটু হাওয়া
এমন দিনে গরম খিচুড়ি
আরাম করে খাওয়া।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

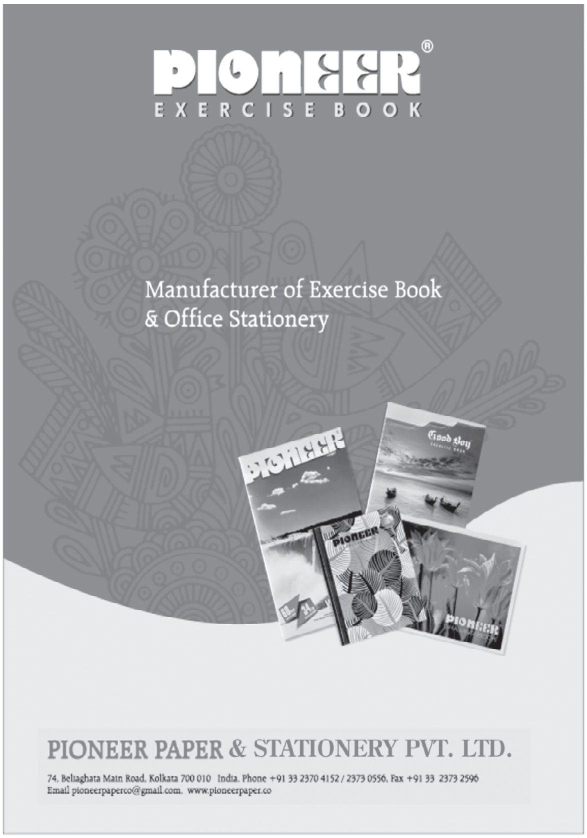

HAR GHAR SIP

SIP is one of the simplest ways to Invest and Create your Wealth.

Start an SIP

Take The First Step to

FINANCIAL FREEDOM!

Mr Debashis Dirghangi CFP®

AMFI REGISTERED MUTUAL FUND DISTRIBUTORS

DRS INVESTMENT

PMS | MUTUAL FUND | INSURENCE | MEDICLAIM | FD | BOND

Website: https://drsinvestment.com

Email.: drsinvestment@gmail.com

Contact @ 9748978406 / 8240685206

বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ার দিনে আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদকে মনে রাখতে হবে

কল্যাণ গৌতম

বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পাশ করেছেন যারা, জেনে রাখুন ‘বাংলা পড়াটা এক সময় কত অপমানজনক ছিল।’ এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন গড়ে তুলে তাঁর ঋণ শোধ করতেই হবে। ‘বাংলাভাষায় উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় বই রচিত হোক, গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা হোক বাংলা ভাষায়’।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম বাঙ্গালির মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের সুযোগ করে দেয়, তার ব্যবস্থা করেন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মাতৃভাষা চর্চার এত বড়ো উদ্যোগ নিলেন তিনি, অথচ বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তা ভালোভাবে নিল না; চারদিকে তাঁরা প্রবল রঙ্গব্যঙ্গ করতে লাগলেন। উদ্যোগকে স্বাগত-সমর্থন তো করলেনই না, উপরন্তু যারা বাংলা নিয়ে পড়ছেন, তাদের যত্রতত্র অপমান করতে লাগলেন; তীব্র বিদ্রূপের শিকার হলেন তাঁরা। সমকালীন বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন, ভাষা হিসেবে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ইংরেজি; বাংলায় যারা প্রবন্ধ ও সাহিত্য লেখেন, সভা-সমিতিতে ভাষণ দেন, বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাদের মেধা ও বোধ একেবারে তলানিতে। এরকম আটপৌরে ভাষা এম.এ ক্লাসে পড়বে কী! আজও কিন্তু অবস্থার ব্যত্যয় ঘটেনি কোনো।

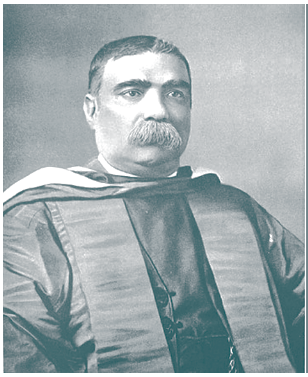

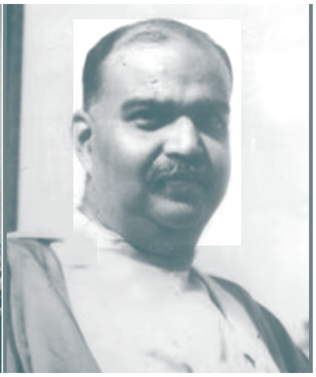

বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষের কানে গেল বাংলা নিয়ে ছিছিক্কার করছেন বুদ্ধিজীবীরা। অনেক লড়াই করে এ কাজ তিনি শুরু করিয়েছিলেন। ভালো ছেলে-মেয়েরা বাংলা পড়তে অস্বীকার করায় খুব দুঃখ পেলেন তিনি। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। ‘আপনি আচরি ধর্ম/পরেরে শেখাও’ আপ্তবাক্যটিকে বাস্তবে রূপ দিলেন। তাঁর মধ্যমপুত্র যিনি আই.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্যপদক পেয়েছেন; যিনি বি.এ ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, তাঁকেই পাঠালেন বাংলায় এম.এ পড়াতে; চারিদিকে মহা শোরগোল পড়ে গেল। পিতার ইচ্ছেকে সম্মান দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজি নিয়ে এম.এ পড়তে গেলেন না, ভর্তি হলেন বাংলায় এম.এ পড়তে। ইংরেজি তাড়িয়ে বাংলা সওয়াল করা রাজনীতিবিদদের মতো ছিলেন না আশুতোষ। অন্যকে বলবেন বাংলামাধ্যমে পড়ো, আর নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিকে ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি করিয়ে সুখনিদ্রা দেবেন, এরকম ধাতের মানুষ ছিলেন না আশুতোষ। আর এজন্যই ‘বাঙ্গলার বাঘ’-এর পুত্র হয়ে উঠলেন ‘ভারতকেশরী’।

১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় এম.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন শ্যামাপ্রসাদ। পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করলেন ‘The social plays of Girish Chandra’, অর্থাৎ নাটক নিয়ে কাজ। এম.এ পাশের পর ল’ পাশও করেছেন তিনি। ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতেও গিয়েছিলেন। এমন একজন কৃতী ছাত্র তাঁর পিতার আদেশে এবং কর্মযজ্ঞে নিজেকে একান্তে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলায় এম.এ পড়াকালীন বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী সুধাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো (১৬ এপ্রিল, ১৯২২)। এই শ্যামাপ্রসাদকে দেখা যায় বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর উৎসাহ অনুপ্রেরণা তো ছিলই, শ্যামাপ্রসাদ প্রশাসনে এসে আরও সক্রিয় হয়ে উঠলেন লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের কাজে, বঙ্গ ফোকলোর চর্চায় এলো নবদিগন্ত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্যের হারামণি সংগ্রহে আশুতোষকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। আশুতোষের মৃত্যুর পর এই প্রকল্প প্রায় অনাথ হয়ে গেল। ভাঁটার মরশুমে এগিয়ে এলেন স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ। তিনি নিজে বাংলার ছাত্র, তাই জানতেন গীতিকা সংগ্রহ ও গবেষণার কাজটি কতটা মূল্যবান। তা ছিল বাংলা ভাষা সংস্কৃতির অনন্য উত্তরাধিকার। নিজে ‘Bengali Ballads Committee’-র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন, দীনেশবাবুর কাজ যথোচিতভাবে সম্পন্ন করতে অগ্রসর হলেন। সরকারি কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, এই কাজের গুরুত্ব কতটা, তা হারিয়ে গেলে সাহিত্যের ইতিহাসে কী ক্ষতি! এতে কাজ হলো; গীতিকা সংগ্রাহক-গবেষকদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা গেল, সংগ্রহের কাজ এগোলো জোর গতিতে, মুদ্রিত হতে লাগল ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার টেক্সট।

শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর উপাচার্যকালীন সময়ে (৮ আগস্ট, ১৯৩৪— ৭ আগস্ট, ১৯৩৮) বাংলাভাষার জন্য আরও প্রশাসনিক কাজ

করেছিলেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন তৈরির পৌরোহিত্য করলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনিই সেই পুরেহিত যিনি মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করালেন। বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণে এগিয়ে এলেন; বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা রচনা ও সংকলনের নেতৃত্ব দিলেন, বাংলাভাষায় পিএইচডি গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনিই সেই সাহসী মানুষ যিনি বাংলাভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দেওয়ার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিচ্ছদে অংশগ্রহণের কৃতিত্বও তাঁর। কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের কুচকাওয়াজে বাংলাভাষায় রচিত জাতীয় সংগীত গীত হলো; ছাত্রদের পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি, তাঁরা গাইছেন রবীন্দ্র সংগীত— 'চলো যাই চলো যাই চলো/যাই চলো যাই/চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে, /চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে,/চলো মুক্তিপথে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র থেকে জানা যায়, বাংলাভাষার মর্যাদাবৃদ্ধির কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না প্রশাসক শ্যামাপ্রসাদ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাভাষায় অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করলেন '...আপনাদের জ্ঞান-সাধনা অক্ষয় ও জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি...।' লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে বাংলায় অভিনন্দন বার্তা লিখলেন (১৫ জুন, ১৯৩৬), '...লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ঃক্রম শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় এই প্রাচ্যভূমি হইতে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং আমাদের আন্তরিক কামনা জানাইতেছি যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় জয়যুক্ত হউক, তাহার কর্মক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করুক এবং তাহার শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের আদর্শ কালজয়ী হউক...।' যদিও উভয়ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি তর্জমা ছাপানো হয়েছিল। বাঙ্গালি হিসেবে এটা গর্বের যে, নাগপুর (১৯৩৬), বোম্বাই (১৯৩৭), পাটনা (১৯৩৭), গুরুকুল (১৯৪৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে আমন্ত্রণ বাঙ্গালি হিসেবে আমাদের সম্মান বাড়িয়েছে।

বাংলাভাষার প্রভাব খর্ব করতে মুসলিম লিগ 'উর্দু অ্যাকাডেমি' গড়ে তুলে বাংলাভাষা বিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করেছিল, তার সঙ্গে মজহবি উন্মাদনা মিশিয়ে বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা জাগরণের কৌশল নিল তারা। বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে প্রচার চালানো হলো, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ইসলামবিরোধী, সহি মুসলমান তিনিই হবেন যিনি উর্দু ভাষা ব্যবহার করবেন। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার বহু সুসন্তান সমগ্র ভারতে এবং কয়েকজন সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বজগতে তো দূরের কথা সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি বা মর্যাদা লাভ করিয়াছে এরূপ বাঙ্গালি নাই বলিলেই চলে। ইহার এক ব্যতিক্রম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।'

যে সমস্ত অধ্যাপক-শিক্ষক-গবেষক-ছাত্রেরা আজ বাংলা নিয়ে পড়ছেন, তারা আজ ভুলে গেছেন শ্যামাপ্রসাদ ও আশুতোষ মুখার্জীর কৃতিত্ব। যে বাংলা বিষয়ে পড়াটা রঙ্গব্যঙ্গের পর্যায়ে ফেলেছিলেন বঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ, তারা আজও সমানভাবেই সক্রিয়। অনেক বাঙ্গালি বিদ্বজ্জনের কথায়— 'বাংলাভাষাটা ঠিক আসে না', তাদের ঔদ্ধত্য ক্ষমাহীন। বিজ্ঞানী হলে তো কথাই নেই, তাদের অধিকাংশই ভাবেন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না, বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা একটা ছোটোলোকামি ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যারা বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্রকে প্রকাশ করতে পারেন না, তারা হয় বিজ্ঞান জানেন না, নতুবা বাংলা জানেন না।

এত সমৃদ্ধ যে ভাষা, এত রকমারি সাহিত্য লেখা হয়েছে যে ভাষায়, এত দর্শন প্রকাশিত হয়েছে যে মাধ্যমে, তার দ্বারা বিজ্ঞান চর্চা কেন হবে না? যদি বঙ্গের বিজ্ঞানী সমাজ এখনও এগিয়ে না আসেন, তবে বাংলাভাষার গবেষক-শিক্ষকদের সমবেত উদ্যোগে এই কাজের শুভ সূচনা হোক। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা এগিয়ে আসুন। সমস্ত বিদ্যাশৃঙ্খলার জন্য কার্যকরী পরিভাষা, শব্দবন্ধ, বাক্যগঠনের রূপরেখা স্থির হোক। বিজ্ঞানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলার একটি কোর্স থাকুক, যাতে বিশিষ্ট মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি স্থান পেতে পারে। কর্মশালার আয়োজন হোক দিকে দিকে, বাংলা-বিদ্যাবিদেরা দেখিয়ে দিন তাদের পারদর্শিতা। 'বাংলাভাষায় বিদ্যাচর্চা সম্ভব নয়' তা যতক্ষণ পর্যন্ত জগদ্দল পাথরের মতো বাঙ্গালিদের মগজে গেঁথে থাকবে, ততদিন বাংলাভাষার অধ্যাপক-গবেষকরা 'বেঙলার মেস্টার' হয়েই ক্ষুদ্র, নগণ্য হয়ে রয়ে যাবেন। শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা-চেতনা যদি কারও মনে একটুও দাগ কেটে থাকে, তাহলে এই প্রচেষ্টার অবিলম্বে বাস্তবায়ন হোক।

বাংলাদেশের কম মেধার বিজ্ঞানীদের চাইতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিশ্বের নানান স্থানে অধিষ্ঠিত বাঙ্গালি প্রবুদ্ধমানুষের মেধা আরও ক্ষুরধার। বাংলায় যাবতীয় গবেষণাপত্র লেখার কাজ তাই শুরু হোক, প্রতিটি বিষয়ে প্রকাশিত হোক বিশ্বমানের গবেষণা পত্রিকা। ইন্টারনেট ঘাঁটলে যে অনাবশ্যক আরবি-ফারসিকে মিশ্রিত বাংলায় অসংখ্য লেখাপত্তর পাওয়া যায়, দু'টি পঙ্ক্তি পড়ার পর সুখপাঠ্য মনে হয় না, তাকে ছাপিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় ভোরের পাখি গেয়ে উঠুক। বঙ্গের পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রমাণ করে দিন, বাংলাভাষায় এত দীনতা নেই, যে তা অপ্রকাশ্য। কোনো অজুহাতই শুনবেন না, কাজ করে দেখিয়ে দিন, মাত্র দশ বছরে আরব্ধ কাজের যথাযোগ্য বোধন হয়ে যাবে। মাতৃভাষাকে যিনি মর্যাদা দিতে পারেন; তিনি একজন ব্রততী, তাঁকে হয়ে উঠতে হবে একজন আরোহী, তাঁর লতিয়ে ওঠার মাচা করে দেওয়া দরকার। এত বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষাকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি বাঙ্গালিরা। বাঙ্গালি হিসেবে এ দুঃখ কোথায় রাখি! আমাদের একজন রবীন্দ্রনাথ থাকতেও পারিনি।

যা গেছে তা যাক। আমাদের আবেদন, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে রাঢ়বঙ্গে স্থাপিত হোক Indian Institute of Bengal Studies। সেই সঙ্গে বঙ্গবিদ্যাচর্চা একটি সারস্বত রূপলাভ করুক।

ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভাষার গৌরব-সম্পাদনী সভা-সমিতি এবং সারস্বত প্রতিষ্ঠান তখনই কার্যকরী, সাফল্যমণ্ডিত হবে, যখন ধ্রুপদী স্বীকৃতি পাওয়া ভারতীয় ভাষাগুলিতে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন এবং গবেষণার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচিত হবে। বিদ্যার্থীরা সেই ভাষায় গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখার, জমা দেওয়ার এবং তার মূল্যায়নের অনুমতি চাইতে পারবে কর্তৃপক্ষের কাছে। কৃষিবিজ্ঞানের গবেষণা পত্রিকাগুলি যখন ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলিতে বিজ্ঞান-প্রবন্ধ ছাপবে। কিন্তু তার মানে এই নয়, ইংরেজি বা অন্যান্য চালু ভাষায় গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। নতুন ভাষার সঙ্গে ভাব হয়েছে মানে, মাতৃভাষা ভুলে যাবো না।

ধ্রুপদী বাংলার কার্যকরী বিকাশের জন্য চাই 'ভারতীয় বঙ্গবিদ্যা সংস্থান' (Indian Institute of Bengal Studies), দাবি উঠেছে সচেতন রাষ্ট্রহিতৈষীদের মধ্যে। সম্প্রতি বাংলাভাষা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পেয়েছে। স্বভাবতই বাঙ্গালি এই মর্যাদায় আনন্দিত ও উৎফুল্ল। তারা চাইছে ও চাইবে এই ভাষাকে কেন্দ্র করে বোধের বিকাশ এবং ভাষাগত সমৃদ্ধি, মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাক, হতে পারে, বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করা। এর জন্য যা প্রয়োজনীয়, তা হলো গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের বইপত্র বাংলায় রচনা করা। এটা তখনই সম্ভব যখন বাংলাভাষায় কৃষিবিজ্ঞানের যথাযথ পরিভাষা রচনার কাজটি সম্পন্ন হবে। এর জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদের প্রতিটি বিভাগে পারদর্শীদের নিয়ে কমিটি গঠন করে দিতে হবে, সঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসেবে জুড়ে দিতে হবে বাংলাভাষার প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপকদের। আগামী ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে যেন তৈরি হয়ে যায় বিভাগীয় পরিভাষা রচনা ও সংকলনের কাজ। প্রয়োজনে মাসিক কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। যদি এ বিষয়ে কিছু কাজ আগে হয়ে থাকে, তার সংকলনও রেফারেন্স হিসেবে গৃহীত হতে পারে। এখানে কৃষিবিজ্ঞান বলতে সামগ্রিক কৃষির সমস্ত শাখাপ্রশাখাকে ধরা হচ্ছে— ভৌমকৃষি (Agronomy and Horticulture), পশুসম্পদ : পালন ও চিকিৎসা (Veterinary Science), দোহবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Dairy Technology) মৎস্যচাষ ও শিকার (Inland and Marine Fishery), রেশমচাষ (Sericlture), বনবিজ্ঞান (Forestry), কৃষি কারিগরি (Agricultural Engineering) ইত্যাদি। বিভাগ অনুযায়ী পরিভাষার বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করবার পর সংশ্লিষ্ট অনুষদের ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের বর্ধিত সভায় তার তুল্যমূল্য বিচার করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগ থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ইংরেজি টার্মের আলাদা আলাদা বাংলা পরিভাষা তৈরি করা হয়ে থাকলে, তার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

এই কাজে পথ দেখাতে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সমস্ত কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কৃষি অনুষদের পারদর্শী শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও পারদর্শিতায় বাংলাভাষায় আন্তর্জাতিক মানের আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলার গবেষণা পত্রিকা (Interdisciplinary Agricultural Journals) প্রকাশিত হোক। ইংরেজি ভাষায় যেভাবে, যে পরিবেশনে ও উপস্থাপনায় গবেষণা প্রবন্ধগুলি লেখা হচ্ছে, সেই একই আদলে সম্পূর্ণ বাংলাভাষায় গবেষণাপত্র প্রকাশ করা দরকার। কেবল তার সঙ্গে গবেষণার সারসংক্ষেপ (Abstract) বাংলা ও ইংরেজি যৌথভাষায় থাকতে পারে।

নতুন শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র প্রেক্ষিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠনের জন্য কমিটি যে সুপারিশগুলি করেছে এবং তাতে যে নতুন পাঠ্যসূচি রয়েছে, তাকে অনুসরণ করেই উচ্চশিক্ষার বই রচনা করা দরকার। এজন্য এ রাজ্যের অধ্যাপক-শিক্ষকেরা যদি ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্লাসে বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় (Bilingual) যথাসম্ভব শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন, তবে সামগ্রিকভাবে একটি নতুন উৎসাহের সূচনা ঘটবে এবং পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিপণীগুলির উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাভাষায় শারদীয়া পত্রপত্রিকার সম্ভার বাড়িয়ে কেবল বাংলাভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি সম্ভব নয়, প্রয়োজন এই ভাষায় উচ্চশিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা। আর দরকার অবাঙ্গালিদের জন্য বাংলা শেখার প্রতিষ্ঠান Directorate of Bengali (বাংলা অধিকরণ)। কৃষিবিজ্ঞান, কৃষিবিপণন, প্রশাসনিক নানান কাজে লিপ্ত অবাঙ্গালিদের জন্য বাংলাভাষা শিক্ষার সহজপাঠে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে ব্যবহৃত পরিভাষা দিয়ে তৈরি হোক শিক্ষণীয় বাক্য ও অনুচ্ছেদ।

পরিশেষে দূর করতে হবে এই মানসিকতা যে 'বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা আদৌ সম্ভব নয়।' এত বছর আগে থেকে এত সমৃদ্ধ ভাষা, যে ভাষার লেখক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন, যে ভাষায় এত কোটি মানুষ সারাবিশ্বে কথা বলেন, লেখেন, পড়েন— সেই ভাষায় উচ্চশিক্ষা সম্ভব নয় কেন? বাংলাভাষার দীনতা কোথায়? মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি একটি উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য। বাঙ্গালি শিক্ষাবিদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই ভাষার প্রাণপ্রবাহে জোয়ার আসুক। এই প্রস্তাব কেবল বাংলাভাষার জন্য প্রযোজ্য নয়, ওড়িয়া, অসমীয়া-সহ অন্যান্য ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষার জন্যও প্রযোজ্য।

তথ্যসূত্র :

কৃষির উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অভিসন্দর্ভে ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষা : তবেই হবে সাধারণ মানুষের সম্পদ।

ড. কলাণ চক্রবর্তী এবং ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, Baarta Today, October 25, 2024.

ধ্রুপদীবাংলার কার্যকরী বিকাশের জন্য চাই ভারতীয় বঙ্গবিদ্যা সংস্থান

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি বাংলাভাষা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ধ্রুপদীভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এটা দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ও দাবি ছিল বাঙ্গালির, এইবার তা পূরণ করল সরকার। সমস্ত বাঙ্গালি এই ঘোষণায়, এই মর্যাদায় আনন্দিত এবং উৎফুল্ল হয়েছে। নতুন আশায় তারা বুক বাঁধছে, বাংলাভাষার গাঙে ব্যবহার উপযোগী বান আসবে। বাঙ্গালির উত্তরাধিকার বহন করে কীভাবে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষাভাষীদের যে বোধ, সমৃদ্ধি ও মানসচিন্তার অগ্রগতি সম্ভব, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এবার তা ভাবার সময় হয়েছে।

ভাবতে হবে বাংলাভাষাকে কীভাবে গুরুত্বের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে বাড়িয়ে তোলা যায়। অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে যেমন বাংলাকে জনপ্রিয় করানোর চেষ্টা থাকবে, পাশাপাশি বাংলাভাষীদের মধ্যেও বাংলাকে জনপ্রিয় করতে হবে. কারণ এখনও অনেক বাঙ্গালি শিক্ষাবিদ মনে করেন ভাষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে রেখে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা একেবারেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এঁদের সম্পর্কে একটি কথা বলতেন, হয় তারা ভাষাটি জানেন না, অথবা বিজ্ঞান জানেন না। এটি সঠিক মুহূর্তে যে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যথাসম্ভব বাংলাকে ব্যবহার করার সওয়ালের সময় এটা। পাশাপাশি বঙ্গসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির যে অমূল্য সম্পদ ইতিউতি রয়েছে তা প্রদর্শনের মাধ্যমে একটি কার্যকরী পর্যটন ব্যবস্থা বা ট্যুরিজম গড়ে তোলা যায়।

যে বিষয়গুলি ভাবা যায় তা এরকম হতে পারে :

১. বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিবিড় চর্চার প্রয়োজনে, বহুল ব্যবহারের লক্ষ্যে, গবেষণার সুসংবদ্ধ উদ্দেশ্যে 'Indian Institute of Bengal Studies' নামক একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন। এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানটির নাম এটাও হতে পারে— 'ভারতীয় বঙ্গবিদ্যা সংস্থান'। প্রস্তাবিত সংস্থানটি প্রতিষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং অন্যান্য ধ্রুপদীভাষার পারস্পরিক সমন্বয়ের আবহে। কলকাতার নিউটাউনে মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করে রাজ্যের চারটি স্থান যথা দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান জেলা), শান্তিপুর (নদীয়া জেলা), বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) এবং আলিপুরদুয়ার (আলিপুরদুয়ার জেলা)-এ হতে পারে চারটি উপকেন্দ্র। প্রতিটি উপকেন্দ্র নিকটস্থ জেলাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবে, উপভাষাগত শব্দ ও পরিভাষা সংগ্রহ ও সংকলন করবে, আঞ্চলিক লৌকিক উপাদান সংগৃহীত হবে, কৃষি ও গ্রামীণ শিকড় সংস্কৃতির যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ, সংকলন ও বিশ্লেষণ করা হবে। মুলকেন্দ্র ও চারটি উপকেন্দ্রে পাশাপাশি তৈরি হতে পারে বঙ্গসংস্কৃতির কার্যকরী নিউজিয়াম, যা গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠবে। মিউজিয়ামের নামকরণ করা যেতে পারে সেই অঞ্চলের বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নামে।

২. বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা দানের পুরোপুরি ও স্বনির্ভর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। একটি ধ্রুপদীভাষা গড়ে ওঠে বহুযুগের বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত লেখকদের, কথকদের এবং সেই ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের সক্রিয় প্রয়াসে। তাই সেই ভাষার ক্ষমতা অসীম। তাই সেই ভাষায়-ভাবনায় অতুল্য দৃষ্টিভঙ্গী। এই সম্পদ ও ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই বাংলাভাষায় যে কোনো বিষয়ের গবেষণা/অভিসন্দর্ভ এবং গবেষণাপত্র রচনা কঠিন নয়। কিন্তু তার জন্য কিছু শিক্ষাবিদদের অনমনীয়ভাব কাটাতে হবে এবং সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যথাযোগ্য ছাড়পত্র দিতে হবে। মনোযোগ দিতে হবে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনায়। বইগুলি যথেষ্ট উচ্চমানের হওয়া দরকার। বইগুলো সুখপাঠ্যও হতে হবে। দরকার অতি উচ্চমানের বাংলাভাষায় প্রকাশিত বিবিধ জার্নাল। অবিলম্বে তা সব বিষয়ের জন্য চালু করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের অন্তর্দৃষ্টি, মন্তব্য, প্রস্তাব ও উপদেশগুলি যদি একটি গুগুল ফর্মে কয়েকটি প্রশ্নের আকারে দেওয়া হয় এবং প্রেরিত উত্তরগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে একটি সুন্দর পথনির্দেশ এক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে পারে।

৩. ভাষা প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে একটি সদর্থক ভিশন থাকা জরুরি। একটি সময়সীমা করে দিতে হবে, কত মাস বা কত বছরের মধ্যে কোনো লক্ষ্যে আমরা উপনীত হবো। আগামী ১০ বছরের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রচনা করা দরকার। বাংলাভাষা প্রচারের অগ্রগতি বিষয়ে নিয়মিত অনলাইন ও অফলাইনে বৈঠক চাই, কাজে কতটা ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে এবং কেন, তার অডিট চাওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় স্তরে 'Directorate of Bengali' গঠন করলেই সবচেয়ে ভালো।

৪. যে সব ভাষা ধ্রুপদীভাষা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের অনেকের যেমন বাংলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শতকের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। জায়গায় জায়গায় সাহিত্যের ইতিহাসে অধীত জ্ঞানের কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে। ভাষার ইতিহাস-রূপ একটি মালার এক একটি 'আঙটা' বা 'কড়া' হচ্ছে বিভিন্ন শতাব্দীর প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি বা শিলালিপি/ধাতুলিপিগুলি। সেই মালায় কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। সেখানে আমাদের অনেক কিছু অনুমান করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে সেই ফাঁকগুলি পূরণ করতে পারি কিনা ভাবতে হবে। □

জেহাদি অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের গন্তব্য কোথায়?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনুস ‘রিসেট বাটন’-এ চাপ দিয়েছেন, ৭ মার্চ নেই। ১৫ আগস্ট নেই। নেই ৪ নভেম্বর। ইউনুস ‘রিসেট বাটন’ চেপে বাংলাদেশের পরিবর্তন চান। তবে গোল পাকিয়েছে ‘রিসেট’ কথাটা নিয়ে। নতুন কিছু ‘সেট’ করতে চান না। ‘রিসেট’ হচ্ছে পুরনো কিছু ফিরিয়ে আনা। সম্ভবত তাই হচ্ছে। তার আগে দিবসগুলো সম্পর্কে জানা যাক।

৭ মার্চ। বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসে যে দিনটিকে মুক্তিযুদ্ধের ‘সূচনা দিবস’ হিসেবে গণ্য করা হয়, সে দিনের কোনো গুরুত্ব নেই বলে দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক, বর্তমানে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা গণতান্ত্রিক রায় মেনে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে। বঙ্গবন্ধু আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালে ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন, ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) জনসমুদ্রে কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন বাঙ্গালি জাতিকে। সে ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। বঙ্গবন্ধু সে ভাষণে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ অনমনীয় আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চ কালো রাতে

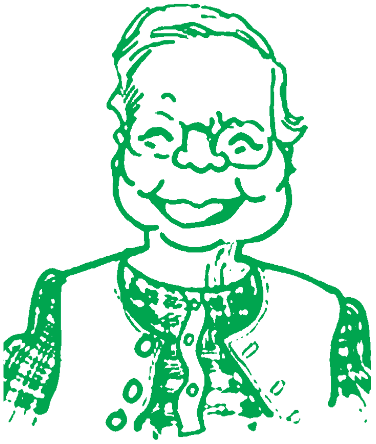

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হিংস্র পাশবিকতায় বাঙ্গালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে শেখ মুজিব মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ, আর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তাঁর আস্থাভাজন চার নেতা কলকাতায় গিয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করেন। থিয়েটার রোডে স্থাপিত হয় বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের কার্যালয়। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্বের এভাবে অবসান ঘটে।

১৫ আগস্ট। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য ও কয়েকজন বহিষ্কৃত সদস্য মিলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভারই সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে মাঝামাঝি সময়ে তাকে সরকারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি ধরা পড়ে ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজরদারিতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসে নতুন সরকারের দায়িত্ব নেন। সহজাত ঔদার্যের কারণে তিনি দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও মোশতাককে কাছে টেনে নেন এবং মন্ত্রী করেন। হত্যাকাণ্ডের পর অভিযোগ উঠেছিল পাকিস্তান মোশতাককে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র করে, সহায়তা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয় মেনে নিতে পারেনি, পাকিস্তানের বিভাজনের বিপক্ষে ছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতকে ‘উচিত শিক্ষা’ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের কঠোর মনোভাব এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশে থাকায় শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আর এগোয়নি। ভারতের মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তানের প্রায় ৯০ হাজার সেনা আত্মসমর্পণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু পাকিস্তানের পক্ষে অনুরোধ জানিয়েছিল আত্মসমর্পণটা যেন অন্তত সেনানিবাসের ভেতরে হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা সে অনুরোধ রক্ষা করেননি, রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালির বিজয়োল্লাসের মাঝে ১৬ ডিসেম্বর অস্ত্রসমর্পণ করে

পাকিস্তান বাহিনী। সে পরাজয়, লজ্জা ও অপমান পাকিস্তান ও তাদের মুরব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুলতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নেয়। ঘাতকরা দিনটিও বেছে নিয়েছিল ১৫ আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশে ও ভারতের সম্পর্কের কারণে কি?

৪ নভেম্বর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) শেখ মুজিব সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেই সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরই সহযোগী আইনজীবী ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে সংবিধান রচিত হয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড. কামাল হোসেন শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে আওয়ামি লিগ থেকে পদত্যাগ করে গণফোরাম নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি অসুস্থ। কয়েকদিন আগে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, এই বয়সে এসে বিকৃত অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা বহু বার বৈঠকে মিলিত হয়ে আলোচনা করে এই সংবিধান তৈরি করেছিলাম। আমাদের কাজের মূল ভিত্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করা।

গণআন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর থেকেই মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান ও ঐতিহ্য নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। শাসন সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন কিংবা সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে, যার অন্যতম সংবিধান সংস্কার কমিশন। বোঝাই যাচ্ছে, নতুন শাসকদের মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান পছন্দ নয়। যে রকম পছন্দ নয় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, যেখানে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। পছন্দ নয় ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার দিন জাতীয় শোক দিবসে ছুটি থাকার বিষয়টি।

সরকার কয়েকদিন আগে জাতীয় দিবসের তালিকা থেকে আটটি দিবস বাদ দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের (বঙ্গবন্ধুর বড়ো ছেলে, ১৫ আগস্ট নিহত হন) জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের (বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, তিনিও ১৫ আগস্ট নিহত হন) জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট নিহত হন) দিবস, ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস এবং ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আপত্তি আছে বোঝা যায় নতুন শাসকদের, কিন্তু ৭ মার্চ, ১৫ আগস্ট বা ৪ নভেম্বর তো ব্যক্তির নয়। ৭ মার্চ ও ৪ নভেম্বর ধারাবাহিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের জাতীয় দিকনির্দেশনার দিন। ১৫ আগস্ট মুজিব সপরিবারে নিহত হন, এটার চেয়েও বড়ো সত্যিই জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এই সত্যি না মানার অপর পিঠের সত্যি হচ্ছে এই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে দাঁড়ানো। ড. ইউনুস ও তাঁর সহযোগী মূল শক্তি ছাত্র নেতারা কী 'রিসেট' করতে চাইছেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

যে ছাত্র নেতারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটিয়েছেন তারা বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় বলছেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে নয়, ১৯৪৭ সালকে বিবেচনায় নিতে হবে। বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ, সুদূরপ্রসারী। একজন ছাত্র নেতা, যিনি গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যার কাঁধে, বলেছেন, ৭ মার্চ জাতীয় দিবস হওয়ার মতো নয়। নাহিদ ইসলাম নামের এই উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মনে করেন কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'অবশ্যই না'। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, যোগেন মণ্ডল, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী-সহ অনেক মানুষের লড়াই আছে উল্লেখ করে বলেছেন, আমরা তো মনে করি, এখানে একজন জাতির পিতা না বরং অনেক জাতির পিতা আছেন, যাদের অবদানের ফলে আমরা এই ভূখণ্ড-পেয়েছি। স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা এটিকে একটি দলে, একটি ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না।

সরকারঘনিষ্ঠ সংবাদপত্রই প্রশ্ন তুলেছে, তাই যদি হয়, যোগেন মণ্ডলের চাইতে চট্টগ্রাম বিপ্লবের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের অবদান অনেক বেশি। যোগেন মণ্ডল তো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাকিস্তানকে সমর্থন করেন। পাকিস্তানের মন্ত্রী হন। পরে পাকিস্তানের হিন্দু বিদ্বেষ বুঝতে পেরে রাতের আঁধারে কলকাতা পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে পদত্যাগপত্র পাঠান। সংবাদপত্রে আরও বলা হয়েছে, অন্যদিকে বাঙ্গালির স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার আন্দোলন বেগবান হওয়ার অনেক আগেই এ কে ফজলুল হক ১৯৬২ সালে এবং হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি ১৯৬৩ সালে মারা যান। আবুল হাশিম বেঁচে থাকলেও রাজনীতিতে কখনো সক্রিয় ছিলেন না। তবে মুসলিম লিগের রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন এবং মূলত লেখালেখির জগতেই ব্যস্ত থাকতেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি যখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, তখন চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ্গ মওলানা ভাসানীকে বেজিঙে ডেকে নিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে নিষেধ করেন। ফিরে এসে একেবারে পালটে যান, ভোটের আগে ভাত দাবি করে নির্বাচন বন্ধের চেষ্টা করেন। তিনি ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন। সংবাদপত্র প্রশ্ন করেছে, এই তালিকায় মাস্টারদা সূর্য সেনের নাম কেন এল না, যিনি এই ভূখণ্ডে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন?

গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র-নেতাদের

কৌশলটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারা আওয়ামি লিগকেই নিশ্চিহ্ন করতে চান। বঙ্গবন্ধুকেও। নোবেল জয়ী ইউনুস তো চাইবেনই। কারণ শেখ মুজিব পাকিস্তান ভেঙেছেন, ভারতকে পাশে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। যিনি পাকিস্তানি আমলের অর্ধেক সময় অর্থাৎ প্রায় ১২ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুবের পতন হয়, মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা আর টেকেনি। ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইসলামাবাদ নিয়ে যায়, সেখানে সামরিক আদালতে রাষ্ট্রদোহের অপরাধে বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করায় এবং ভারতের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক চাপ প্রবল হয়ে ওঠায় মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়ে ওঠেনি। বরং আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনাদের রক্ষার স্বার্থে তাঁকে ফেরত পাঠাতে হয় ঢাকায়। মুজিব ফেরেন যুদ্ধজয়ী বীরের বেশে। পাকিস্তান এই পরাজয় ভোলেনি, ভোলেনি তাদের মুরুব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও।

আওয়ামি লিগ সেই পঞ্চাশের দশক থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতন্ত্র ফিরিয়েছে। ভুল-ত্রুটি অবশ্যই আছে, শেখ হাসিনা নির্বাচনে জয়ী হতে শাসনক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, তাঁর দলের নেতাদের নির্বিচার লুটপাট, জায়গা-জমি দখল এবং ব্যাঙ্কের টাকা লোপাট করে বিদেশে নিয়ে যাওয়া তিনি ঠেকাতে পারেননি। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগের মতো প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম হিন্দু প্রধান বিচারপতি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে চাওয়ায় বন্দুকের মুখে পদত্যাগ করে বিদেশে চলে যেতে হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুরা আওয়ামি লিগের ভোটব্যাঙ্ক হলেও তাদের ওপর হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর ও জায়গা-জমি দখলের ঘটনা কম ছিল না।

সংখ্যালঘুদের কোনো দাবি শেখ হাসিনা মানেননি। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, হামলা ও দখলবাজির কোনো ঘটনার বিচার হয়নি। বলতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়, শেখ হাসিনা আওয়ামি লিগের গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষা করেননি। অবশ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা ভালো সুযোগ পেয়েছেন, মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় পেয়েছেন। যার মূল্য সংখ্যালঘুরা পাচ্ছে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ব্যাপকভাবে হামলার শিকার হয়ে।

একটা ঘটনা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ঢাকায় পালিত হয়েছে পাকিস্তানের জাতির জনক মহম্মদ আলি জিন্নার ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। গত ৫৩ বছরে জিন্নার জন্ম কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী বাংলাদেশে পালিত হয়নি। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাও ফিরে এলেন বাংলাদেশের মাটিতে। আলোচনা সভায় উপস্থিত বক্তারা মহম্মদ আলি জিন্না না থাকলে পাকিস্তান সৃষ্টি হতো না, আর পাকিস্তান না থাকলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না বলে মন্তব্য করেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় পাকিস্তান দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার কামরান ধাঙ্গাল। নওয়াব সলিমুল্লাহ অ্যাকাডেমি আয়োজিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান মহম্মদ আলি জিন্নার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনাবলি বর্ণনা করেন। ঘটনাপ্রবাহ পরিষ্কার করে দিচ্ছে, অধ্যাপক ইউনুস 'রিসেট বাটন' চেপে কোথায় ফিরতে চান।

জেহাদি অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের গন্তব্য কোথায়! অন্তর্বর্তী সরকার শাসন সংস্কার করতে চায়। অধ্যাপক ইউনুস দেশকে এক পরিবার দেখতে চান। এজন্যে প্রায় এক ডজন কমিশন তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোনো কমিশনে সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। প্রশাসন থেকে, পুলিশ থেকে আওয়ামি লিগ বিদায় করার নামে যাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের মধ্যে সিংহভাগই হচ্ছে হিন্দু সমাজের মানুষ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে হিন্দু শিক্ষকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষ করে বিভিন্ন টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে হিন্দু সাংবাদিক কিংবা কর্মকর্তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কিংবা অগুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যও ভাঙা হয়েছে। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের কথা উঠেছে, কারণ ওটা হিন্দু রবীন্দ্রনাথের লেখা। এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পুরোপুরি ইসলামীকরণের দাবি উঠেছে, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে যাদের নিয়ে নতুন কমিটি হয়েছে তাদের বাছাই করা হয়েছে ইসলামি ধারা থেকে।

শেখ হাসিনা মুসলমানদের মন পেতে কওমি মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষার সম্মান করেছিলেন, হেফাজতের দাবি মেনে পাঠ্যপুস্তক থেকে রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন, অনেক হিন্দু লেখকের লেখা বাদ দিয়েছেন। এ কারণে হেফাজতে ইসলাম তাকে 'কওমি জননী' আখ্যা দিয়েছিল সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ ডেকে। জেহাদি অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাকে হটাতে এই হেফাজতে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর জেহাদি এই কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা স্নাকোত্তর পাশ করে সরকারি চাকরিতে ঢুকছে। প্রশাসন ধীরে ধীরে তাদের কবজায় যাচ্ছে। মহম্মদ ইউনুস 'রিসেট বাটন' টিপে যেখানে ফিরতে চাইছেন, তারাই তাকে পথ দেখাতে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে জামায়াত, হিযবুত তাহরীরা। বিচিত্র রাজজোটক! □

হিন্দু ভাবাবেগের উপর ইসলামি ষড়যন্ত্র

হোটেল-রেস্টুরেন্ট ব্যবসার আড়ালে খাদ্য জেহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২৩ অক্টোবর করিমগঞ্জ, অসম। বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মোল্লাবাদীরা ভারতের নানান স্থানে অশান্তি সৃষ্টি করেই চলেছে। পরিকল্পিতভাবে হিন্দু ভাবাবেগের উপর আঘাত হেনে চলেছে। সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনা জনসমক্ষে এসেছে। ত্রিপুরার কদমতলায় হিন্দু দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে মূল্যবান সামগ্রী লুঠপাট করে। ত্রিপুরারই কৈলাশশহরে জেহাদিরাই মসজিদে আগুন লাগিয়ে হিন্দুদের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। অসমের করিমগঞ্জে পূজার আগে মূর্তিতে এঁটোভাত ছিটিয়ে অপবিত্র করে । সেখানকারই চেরাগী বাজার এলাকায় এক হিন্দু যুবককে চিকেনের মধ্যে এক টুকরো গোমাংস দেয়। যুবকটি সেখানে প্রতিবাদ করলে তাকে হোটেল কর্তৃপক্ষ মারতে উদ্যত হয়। পুলিশি হস্তক্ষেপে তাকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একইভাবে মুসলিম হোটেল-রেস্টুরেন্টের মালিকরা ষড়যন্ত্র করে হিন্দুদের গোমাংস পরিবেশন করছে। হোটেল-রেস্টুরেন্টে হিন্দু দেবী-দেবতার ছবি টাঙিয়ে রাখা, হিন্দু নাম ব্যবহার করা, সবই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। মুরগি বা পাঁঠার মাংসের বিভিন্ন পদের মধ্যে গোমাংস মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চেরাগী বাজারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সেই হোটেল মালিককে গ্রেপ্তারের দাবির পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত মুসলিম হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে দেব-দেবীর ছবি সরানো, হিন্দু নাম ব্যবহার বন্ধ করা, প্রতিটি হোটেল-রেস্টুরেন্টের মালিক ও কর্মচারীদের নাম ছবি-সহ টাঙিয়ে রাখা এবং খাদ্য তালিকা টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করারও দাবি জানিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই নিয়ে একটি স্মারকপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুদের ধর্মনাশ করার ষড়যন্ত্র চলছে গোটা অসমে। রাজ্যের প্রায় সর্বত্র হিন্দু নাম ও ছবির ব্যবহার করে মুসলিম ব্যবসায়ীরা হোটেল -রেস্টুরেন্ট খুলছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত এই খাদ্য জেহাদ নিয়ে হোটেল মালিকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনেছে।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট স্ক্যাম : সাবধান হওয়ার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৭ অক্টোবর ১১৫তম 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে নতুন একধরনের জালিয়াতির বিষয়ে সতর্ক করে দেন। এর ফাঁদে পড়ে ইতিমধ্যে বহুজন লক্ষ লক্ষ টাকা হারান। দেশের বহুস্থানে এমন ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আইপিএস, আরবিআই, সাইবার ক্রাইম অফিসারের বেশে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে অজানা অপরাধের ভয় দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ছে। তারা আধারকার্ড, বাড়ির ঠিকানা, কর্মক্ষেত্র, সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট প্রভৃতি নানান তথ্য তুলে ধরে সাধারণ কলে বা ভিডিয়ো কলে বড়ো কোনো অপরাধের কথা বলে ভয় দেখায় এবং সরকারি নথিপত্র, অভিযোগপত্র দেখিয়ে অপরাধীরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ডিজিট্যালি গ্রেপ্তার করে টাকা না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে গুজরাতের এক মহিলা এক লক্ষ টাকা হারান। অপরদিকে উত্তরপ্রদেশে একব্যক্তি বিষয়টি সন্দেহ করে প্রতিপক্ষকে পালটা হুমকি দিলে ফোনটি কেটে দেয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখনই এমন কল আসবে প্রথমে থামুন, ভাবুন, অ্যাকশন নিন। অপরাধ না করে থাকলে বিন্দুমাত্র ভয় পাবেন না।

শোক সংবাদ

পুরাতন মালদা নগরের মঙ্গলবাড়ির প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রিয়নাথ বিশ্বাস গত ১ অক্টোবর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা অমৃতি খণ্ডের স্বয়ংসেবক বিলাস মণ্ডল গত ৭ অক্টোবর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন। তিনি পাঁচকড়িটোলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

* * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক স্বপন চৌধুরীর বাবা সুজিত চৌধুরী গত ৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং ১ নাতনিকে রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক অঙ্কুর দাসের মা শেফালি দাস গত ১৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ এবং ২ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটির স্বয়ংসেবক প্রদীপ দাসের মা শান্তিলতা দাস গত ১৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। বহু প্রচারক ও কার্যকর্তা তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়েছেন।